মার্চ ২০২৩ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

স্বাধীনতার গল্প শোনো

নাওশিন সাইয়েবা সাফা, অষ্টম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

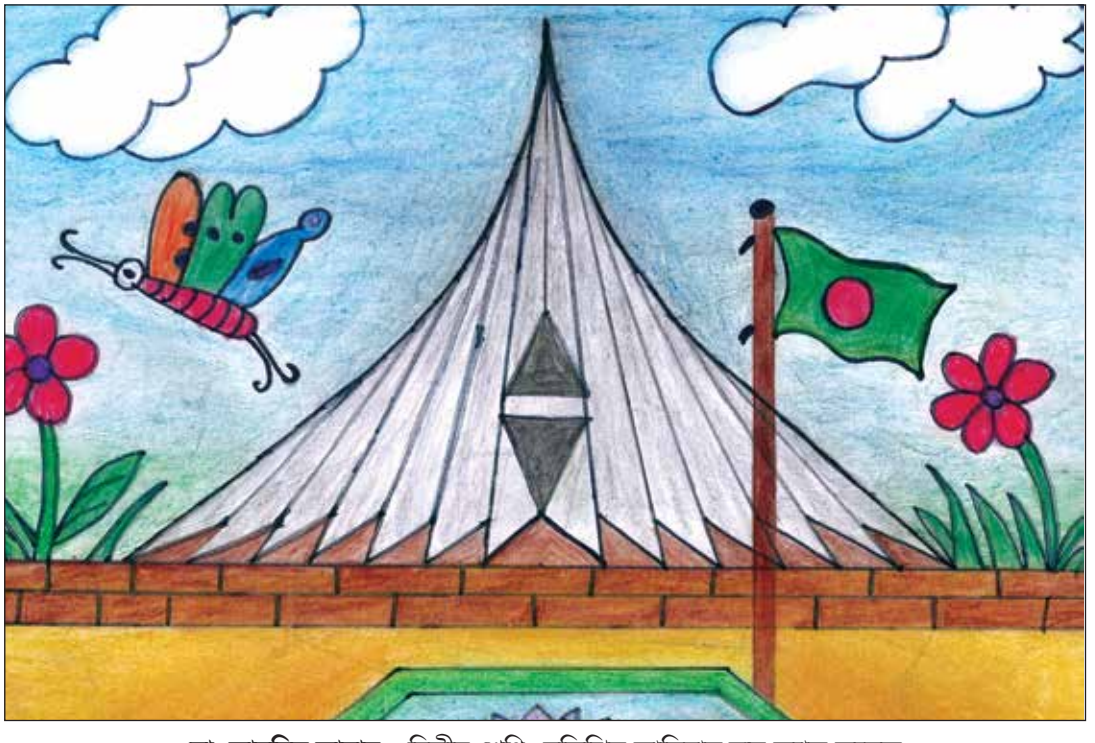

মো. তাহমিদ জামান, দ্বিতীয় শ্রেণি, মতিঝিল আডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, এসে গেছে অগ্নিঝরা মার্চ মাস। নানা কারণে এই মাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালির ইতিহাসে অনেকগুলো দিন আছে, যা আমাদের মনে রাখতে হবে। তেমনি একটি দিন হলো ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। এদিন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেই ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র।

৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।

বন্ধুরা, ৩০ লাখ শহিদের রক্ত, ২ লাখ মা- বোনের সম্ভ্রমহানি এবং সীমাহীন কষ্ট আর ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এত বড়ো ত্যাগ বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে আমরা জানি না। তাই আমাদের জীবনে স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। আমাদের উচিত মনেপ্রাণে দেশকে ভালোবেসে দেশের সেবা করে যাওয়া।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সারা বিশ্বে পালন করা হয় এই দিনটি।

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। এই শিশু দিবসে সকল শিশুর প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারের শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য:

'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন
শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন।'

বন্ধুরা, ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি দেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তাঁর দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। দীর্ঘ সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে তিনি জাতির পিতার মর্যাদা পান। তিনি ছিলেন বিশ্ব বরেণ্য মহান নেতা।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ দিনটিও আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, যা জাতিকে উচ্ছ্বসিত করেছে।

সবাই ভালো থেকো বন্ধুরা।
নবারুণের সাথে থেকো।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

স্বাধীনতার গল্প শোনো/রফিকুর রশীদ ০৩
বঙ্গবন্ধুর শেষ জন্মদিন/খালেক বিন জয়েনউদদীন ১১
স্মৃতিতে মার্চ, চেতনায় বঙ্গবন্ধু/মুহা শিপলু জামান ২৫
বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও জাতীয় শিশু দিবস/জায়েদুল আলম ৩৩
স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক/কে সি বি তপু ৩৮
হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/মনিরুল ইসলাম ৪৭
প্রধানমন্ত্রীর কৃষি খামার/মুনিরা বেগম ৫৩

গল্প

৭ই মার্চের ভাষণ ও সুমনের বদলে যাওয়া/ফরিদুর রেজা সাগর ০৭
বঙ্গবন্ধুকে দেখা/ইমরান পরশ ২২
কাজলী নদী/তৌহিদ-উল ইসলাম ২৮
স্বাধীনতার যুদ্ধ/মাহমুদুল হাসান খোকন ৪১

সাফল্য প্রতিবেদন

দেশে প্রথম শিক্ষা পার্ক/শাহানা আফরোজ ৪৯
বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৫১
বনকোকিল/নাজমুল হক ৫২
ইংল্যান্ডকে বাংলাওয়াশ/মেজবাউল হক ৫৫
মাটির নিচে গ্রাম/আবু নাসের ৫৬
এই গরমে করণীয়/মো. জামাল উদ্দিন ৫৭
নেটদুনিয়া মাতাচ্ছেন ফ্লোরেন্স/জান্নাতে রোজী ৬০
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি/দশদিগন্ত ৬১

কবিতা ও ছড়া

১৩ রকিবুল ইসলাম/মুনির শফিক
১৪ দীন ইসলাম/মো. মোস্তাফিজুর রহমান
২৩ প্রজীৎ ঘোষ
২৪ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান/সোহানা আকতার নুসরাত জাহান
৪০ হিমাদ্রি হাবীব
৫০ জিশান মাহমুদ

ছোটোদের ছড়া/লেখা

৫০ মারিয়াম জাহান
৫৮ সিফাত কাদের/মো. সজীব হোসেন
আশফিয়া আক্তার/মিনহাজুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

১৫ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : নাওশিন সাইয়েবা সাফা/মো. তাহমিদ জামান
তৃতীয় প্রচ্ছদ : নোরিশা রহমান অনন্যা/নিভৃতি রায় সেন
৩২ ইরিনা হক
৩৩ যাহরা তাসনুমা তন্বী
৪৬ উপমা দত্ত তরী
৪৮ মুয়াজ আজিজ
৫৯ প্রদীতি মৃধা/লাবিবা জামান লিবা
৬০ সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন
৬৩ রহমাতুল আলম/তারান্নুম সাদিকা
৬৪ ফাইজা রহমান কণা/রাদিয়া মোস্তফা সামান্তা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

স্বাধীনতার গল্প শোনো

রফিকুর রশীদ

কবি রঙ্গলাল সেন সেই কবে স্বাধীনতা বিষয়ে অসাধারণ কবিতা লিখেছেন :

স্বাধীনতা– হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব– শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

ঠিক তাই, স্বাধীনতা সবাই চায়। বনের পশুপাখিরা স্বাধীনতা চায়। নদীর স্রোতোধারা স্বাধীনভাবে সামনে ছুটতে চায়। গাছে গাছে পুষ্পরাজি নিজের মতো করে ফুটতে চায়। মানুষের তো স্বাধীনতা না হলে চলেই না। কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করতে করতে অনেক সময় বাতাসের অস্তিত্বই ভুলে যায় মানুষ। বাতাস না থাকলে তখন টের পায় বাতাসের কত প্রয়োজন। স্বাধীনতার ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। স্বাধীন দেশে বাস করে সব রকমের স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, এই স্বাধীনতা পেলাম কোথায়, কেমন করে, কবে থেকে! এ সব কথা ভুলে গেলে কি চলে? বৃক্ষ কখনো শিকড়ের কথা ভুলে যায়? তাহলে যে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারবে না। আমাদেরও মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস।

হানাদার বাহিনীর আঘাতে লণ্ডভণ্ড ঢাকা, ২৫শে মার্চ ১৯৭১

সঠিকভাবে সে ইতিহাস জানলে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের কী কী করণীয় সেটাও বুঝতে পারব, দায়িত্বশীল হতে পারব; স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নানাভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কিত করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।

আজ আমরা সবাই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক। আমাদের এই স্বাধীনতা হঠাৎ একদিনে পাওয়া নয়, জাদুকরের মতো বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চোখের পলকে এনে দেওয়া কোনো কিছু নয়। অমল ধবল এই স্বাধীনতা লাভের জন্য দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম ও প্রস্তুতির ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের চূড়ান্ত বাঁক বদল ঘটে ১৯৭১ সালে এসে। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৬শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত আন্দোলন- সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গোটা জাতি অধিকার আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্তির পথ খুঁজেছেন, কিন্তু ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আচমকা হামলা চালিয়ে এ দেশের বুকে অসম এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আত্মরক্ষার তাগিদে বাঙালিকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শত্রু হঠিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আহ্বান জানান প্রিয় জনগণকে। তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছে প্রাণপণে, ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বিজয় এনেছে। এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জাদুকরী নেতৃত্বে এবং নির্দেশে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতির দীর্ঘকালের লড়াই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন অনেকেই, আমরা তাঁদের সবার অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি দিয়ে জনগণকে পরিপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব তুলনাহীন এবং অসমান্তরাল। তাই তো এ জাতি সগৌরবে ঘোষণা দিয়েছে, এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলেরই বাংলাদেশ কিংবা জীবনানন্দের রূপসী বাংলা– গানে কিংবা কবিতায় যতভাবেই বলা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর হাতেই গড়া হয়েছে 'স্বাধীন বাংলাদেশ।' বাংলা নামের এই সবুজ-শ্যামল দেশটি সত্যিকারের স্বাধীন সার্বভৌম কখনোই ছিল না। যুগের পর যুগ ধরে এ দেশ শাসিত হয়েছে (শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে) বিদেশি শাসকদের দ্বারা। ইংরেজদের দুইশত বছরের শাসনের পরও পাকিস্তানি শাসকদের ২৩ বছরের দুঃশাসন আমাদের সইতে

হয়েছে। অতীতের এই সব দুঃশাসনের সময়ে নানা রকম বিদ্রোহ, খণ্ড ও ক্ষুদ্র যুদ্ধও হয়েছে। কিন্তু 'বাঙালি জাতীয়তা'র পরিচয়ে পরিকল্পিত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ ঘটেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই। বাঙালি হয়েও একদা আমাদের পরিচয় ছিল ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি। বাঙালিত্বের গর্বিত পরিচয়কেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে শেখ মুজিব জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা জাতির অন্তরে। সেই স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একক নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বহু আকাঙ্ক্ষিত

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। করাচি এয়ারপোর্টে পাক সৈন্য বেষ্টিত বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১

স্বাধীনতা অর্জন করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে বাঙালির রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সে কারণে স্বাধীনতার পর কৃতজ্ঞ জাতি তাঁকে জাতির পিতা বলে সম্মান জানিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি শাসকেরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে এবং সারা দেশের নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতনে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়, সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে কতক্ষণ টিকে থাকা যায়! পিছু হটতে হয় বাধ্য হয়েই। অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। সেই দুঃসময়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করেন এবং ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে নবগঠিত সরকার সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশকে দখলদারমুক্ত করার জন্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন। সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বভার নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আর প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দীন আহমদ। সঙ্গে ছিলেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুর আলী। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধের জন্য সশস্ত্র ট্রেনিং শুরু করে। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নয় মাসব্যাপী বীরত্বপূর্ণ লড়াই শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাঙালির ঐতিহাসিক বিজয়, পূর্ণ হয় বাঙালি জাতির দীর্ঘকালের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ কেবল দুই দল সৈনিকের মধ্যকার যুদ্ধ ছিল না। গণ মানুষের অংশগ্রহণের কারণে এ যুদ্ধ শুরু থেকেই জনযুদ্ধে রূপ নেয়। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়-খাদ্য-পথনির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে এ দেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ প্রবল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যে সহযোগিতা করেছে, তার কোনো তুলনাই হয় না। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতাপূর্ণ অবদানের পাশাপাশি এ দেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে আমরা যেন কিছুতেই সে কথা ভুলে না যাই। আমাদের স্বাধীনতার গল্প মানেই এইসব সাধারণ মানুষের দীর্ঘকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার গল্প। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো এ দেশের সাধারণ মানুষের মুখেই হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। সেই হাসির মধ্যেই নিহিত আছে স্বাধীনতার সার্থকতা। ■

যশোরে হানাদার বাহিনীর আঘাতে নিহত বাঙালিদের নিথর দেহ, ২৫শে মার্চ ১৯৭১

কথাসাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্যিক

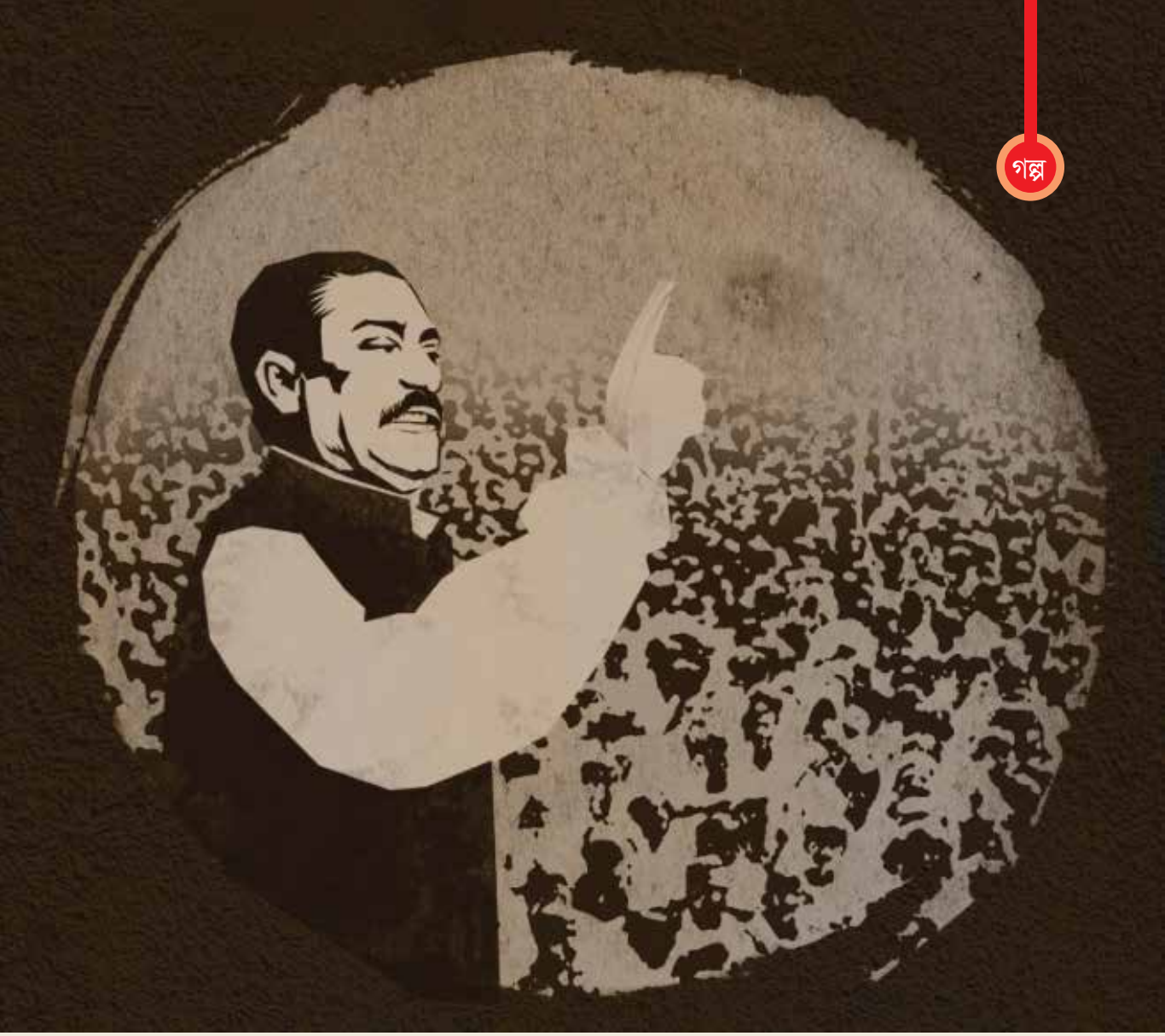

৭ই মার্চের ভাষণ ও সুমনের বদলে যাওয়া

ফরিদুর রেজা সাগর

পড়াশোনা সুমনের মাথায় ঢোকে না। তার স্বপ্ন অন্যরকম। সে পাখি ভালোবাসে। খাঁচায় ভরে একটা টিয়া পাখি পুষেছিল কিছুদিন। বাসার ছাদে সে কবুতর পালন করে। তার প্রায় পনেরোটা পায়রা ছিল। এরমধ্যে তিনটা ছিল গিরিবাজ।

সুমন একটা বেড়াল পোষে। বেড়ালের নাম টাইগার। কালো কুচকুচে বেড়ালটা। সন্ধ্যা হলেই সুমনের পাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে টাইগার।

ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসে সুমন। সাইকেল চালিয়ে গুলিস্তান চলে যেতে ভালো লাগে। বাবার কাছে কীভাবে যেন খবর পৌঁছে যায়। সে সাইকেল চালিয়ে কোথায় কোথায় যায়? একা একা বুড়িগঙ্গার তীরে ঘুরে

বেড়াতে খুব ভালো লাগে সুমনের। সে মনে মনে স্বপ্ন দেখে- একদিন সে হবে নৌকার মাঝি। তারপর নৌকা বেয়ে চলে যাবে দূরে বহুদূরে! একা, সাথে কেউ থাকবে না।

যেখানে বাবা ও টিচারদের লাল চোখ থাকবে না। হাফিজুদ্দিন স্যার ওকে বেত দিয়ে পিটিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখবে না। ও কোনোদিন ফার্স্ট বেঞ্চে বসে ক্লাস করতে পারেনি। পাঠ্যবইগুলো দেখলেই তার ভয় লাগে। নৌকা চালিয়ে সে চলে যাবে এমন এক দেশে যেখানে ভয় নেই। যেখানে নিজের স্বাধীন মতো কাজ করা যাবে। যেখানে থাকবে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

পড়াশোনা ব্যাপারটা সুমনের একেবারেই ভালো লাগে না। বই পড়তে ভালো লাগে না। অঙ্ক করতে ভালো লাগে না। হোমটাস্ক ভালো লাগে না। খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে ভালো লাগে না। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি কেন মানুষ পড়ে? এসব পড়ে লাভ কী হয়? অঙ্ক শিখে কী হবে?

এরকম নানা প্রশ্ন সুমনের মনে খেলা করে। এখন সে ক্লাস সেভেনে উঠেছে অনেক কষ্ট করে। একদিন ওর বাবাকে ডেকে নিয়েছিলেন হেডস্যার।

জানেন তো, আপনার ছেলে খুবই খারাপ রেজাল্ট করেছে।

বাবা মাথা নামিয়ে রইলেন। পাশে সুমন দাঁড়িয়ে আছে। হেডস্যার বললেন,

এই বছরের মতো ওকে পাস করালাম। আগামী বছর তা হবে না। বন্ড দিতে হবে।

বাবা সুমনের দিকে তাকালেন। তারপর কাগজে লিখে দিলেন তিনি সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হবেন। আগামীবার খারাপ হলে তিনি ছেলেকে নিয়ে যাবেন এই স্কুল থেকে।

সুমন সব শুনল। কিন্তু সে নির্বিকার। যদিও স্কুল থেকে তাকে বের করে দিলে তার অনেক ভালো হবে। সে তো স্কুলেই পড়তে চায় না।

বাবা লজ্জায়– অপমানে লাল হয়ে গেছেন। রাগে তার দাঁত কড়মড় করছে। মুখ ফুটে কিছুই বললেন না।

বাসায় ফিরে খুব উত্তমমধ্যম দিলেন সুমনকে। সুমন হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। লাফ দিয়ে এদিক -ওদিক যায়। কিন্তু বাবার হাত থেকে নিস্তার নেই।

তুই একটা গরু। আমি গরু পিটাইয়া মানুষ বানামু।

সুমন জানে তার বাবা খুব রাগী মানুষ। এলাকায় তিনি রাজনৈতিক দলের একজন বড়ো নেতা।

সুমন টের পেল আজ তার মুক্তি নেই। বাবা পিটাচ্ছেন আর বলছেন,

পড়াশোনা ঠিকমতো করবি কিনা বল?

সুমন বলতে থাকে,

করব। করব।

তোকে একটা রিকশা কিনে দেবো। তোর আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই। তুই এখন থেকে রিকশা চালাবি।

সুমন চুপ। তার বলার কিছু নেই।

কথা বলিস না কেন? কথা বল। কথা বল।

চিৎকার করেন বাবা। আবার থাপ্পড় পড়তে থাকে ওর দুই গালে। সুমন কাঁদতে থাকে। এমন সময় মা এলেন। উনি রান্নাঘরে ছিলেন।

কী হচ্ছে এসব? ছেলেকে এইভাবে মারে কেউ?

তোমার গুণধর ছেলে কী করেছে তা ওকে জিজ্ঞেস করো।

সুমনের দু'চোখে অশ্রুধারা। মায়ের আঁচলে সে মুখ লুকায়।

কিন্তু পড়তে যে তার ভালো লাগে না। একথা সে কাকে বলবে?

দুই

তখন ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান নামে আরেকটি দেশ আমাদের শাসন করত। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ তখন নির্বাচনে জয় লাভ করেছে। বাঙালির একচ্ছত্র নেতা তখন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তখন বারবার ছলাকলা করতে লাগল। বঙ্গবন্ধুর হাতে তারা ক্ষমতা অর্পণ করবে না। তখন বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। সবার স্বপ্ন বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। লাল-সবুজ পতাকা উড়বে বাংলার আকাশজুড়ে।

বঙ্গবন্ধু তখন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তিদাতা। জানুয়ারি মাসেই ভোটে নির্বাচিত সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পল্টনে শপথ নেয়। সবার মধ্যে তখন স্বাধীনতার সূর্য ওঠার অপেক্ষা। এল ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। সেদিন বঙ্গবন্ধু দিক নির্দেশনা দিয়ে এক বক্তৃতা দেবেন। লক্ষ মানুষের ঢল। চারপাশ থেকে মিছিল আসছে। জনারণ্যে পরিণত হয়েছে রেসকোর্স ময়দান। প্রতিটা মানুষের মুখে দৃঢ় প্রত্যয়। সবার হাতে লাঠি। কারো কারো বজ্রমুষ্ঠি। গর্জন চলছে রেসকোর্স জুড়ে। স্লোগানে স্লোগানে মুখর সেই প্রান্তর। বাবার হাত ধরে সুমনও এসেছে রেসকোর্সে। বাবা লাঠি হাতে বসেছেন। তার ফর্সা মুখ লাল হয়ে আছে। তিনি খুব উত্তেজিত। যেন ফেটে পড়বেন। সুমনকে বারবার বলেছেন, ভিড়ে হারিয়ে গেলে আমার কিছু করার থাকবে না। আমাকে ধরে রাখবি। বাবার হাত ধরে রাখে সে। মানুষের সমুদ্র দেখে সে খুব রোমাঞ্চিত। দুপুরের পর মঞ্চে বঙ্গবন্ধু এলেন। সাদা পায়জামা- পাঞ্জাবি পরনে কালো মুজিব কোট। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সামনাসামনি শেখ মুজিবকে দেখে আনন্দে থরথর করে কাঁপতে লাগল সুমন। ওর বাবা দূর থেকে সালাম ছুড়ে দিলেন।

বসন্তের চকচকে রোদেলা বিকেল। কোটি বাঙালি তখন আবেগে– উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। মঞ্চে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। তর্জনী তুললেন। যেন বিশাল গর্জন উপচে পড়ল সাগরে। চশমাটা খুলে হাতে নিলেন। তারপর তার মেঘের মতো কণ্ঠস্বরে বক্তৃতা শুরু করলেন–

'ভায়েরা আমার– আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস...'

আমাদের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস তিনি এক নিশ্বাসে বলে গেলেন। বক্তৃতা নয় যেন বাংলার ইতিহাস। পাকিস্তান শাসন আমলের ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস।

সুমন শুনছে আর ভাবছে, তাদের ইতিহাস বইতে এসব পড়ানো হয় না। খোরশেদ আলম স্যার ইতিহাস পড়ান। লাহোর, শিয়ালকোট ও মহেনজোদারো এইসব ইতিহাস। পড়তে হয় বেলুচিস্তান আর পেশোয়ারের ইতিহাস। এসব তো সুমনকে আকর্ষণ করে না। এইসব স্থান সে দেখেনি। তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস পড়তে গিয়ে মন সায় দেবে কেন? বাবা-মাকে এসব বোঝানো যায় না।

সুমন তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। মনে মনে ভাবে, ভিড়ের ভেতর যদি হারিয়ে যায়, তবে সে এক দৌড়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাবে।

বলবে, বঙ্গবন্ধু আমি লাঠি নিয়ে এসেছি। সবার সাথে তাল মিলিয়ে আমি প্রতিরোধ গড়ে তুলব। আমিও যুদ্ধে যাবো।

তখন বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে।

তিনি বলছেন, *আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত অরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।*

সুমন সেই ভাষণ শুনে খুব উদ্দীপিত। তাকে বদলে যেতে হবেই। সুমন অনুভব করে বাংলা ভাষা তার মুখের ভাষা। বাংলাদেশ তার দেশ। অনেক কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করতে হবে। সুমনের মাথার মধ্যে শুধু ঘুরছে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ। কী অসাধারণ! একটা ভাষণই বদলে দিলো পুরো দেশটাকে। সেদিন বাবার হাত ধরে অন্যরকম সুমন ঘরে ফিরল। দৃঢ় মনোবল তার। অনেক স্বপ্ন তার চোখে-মুখে।

তিন

একবার ক্লাস টিচার আলী হোসেন স্যার সুমনকে বলেছিলেন,

তুই তো ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করতে পারবি না। কারণ লেখাপড়ায় তোর মনোযোগ নেই।

খুব মন খারাপ হয়ে যায় সুমনের। সবাই নতুন ক্লাসে উঠে যাবে। অপু, শাকিল তখন ওর উপরের ক্লাসে পড়বে। তাহলে কেমন হবে। সুমনের মনটা খারাপ

হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও পড়াশোনায় ওর মন বসে না। কষ্ট করে যা পড়ে তাও মনে থাকে না। ভুলে যায়। কিন্তু সুমন বদলে গেছে। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার আগে সে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল।

উত্তাল মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অনেক বন্ধুবান্ধব গ্রামে চলে গেছে। সুমনদের স্কুল খোলা আছে। ঢাকার বাসাবোতে ওদের স্কুল। ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন শান্তি কমিটির কয়েকজন।

তারা বললেন,

পাকিস্তান কোনোদিন ভাঙবে না। স্কুল খোলা থাকবে। মে মাসে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হলো। সবাই অবাক হয়ে দেখল, সুমন খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। এক ধাক্কায় ক্লাসে সুমন তৃতীয় হয়েছে।

স্যারদের চোখ কপালে উঠল। রাতারাতি এমন পরিবর্তন কী করে হলো?

অপু জিজ্ঞেস করল,

কি রে সুমন এত ভালো রেজাল্ট হলো কী করে?

সুমন মিটিমিটি হাসল। কোনো উত্তর দিলো না। মনে মনে সুমন বলল,

এই জন্যে ৭ই মার্চের ভাষণের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

একজন নেতা একটি আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়ে বদলে দিলেন দেশের মানচিত্র।

দেশ স্বাধীন করার মতো কঠিন কাজে যদি মানুষ জীবন দিতে পারে তাহলে অ্যালজেব্রা আর জ্যামিতির উপপাদ্য কেন কঠিন হবে?

রেজাল্ট খারাপ বলে সুমনের জন্য বাবা লজ্জা পেয়েছিলেন হেডস্যারের সামনে। এবার রেজাল্ট ভালো করে বাবাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করবে। এখন থেকে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাবা মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছেন। বাবার সঙ্গে যোগাযোগ নাই। সুমন এখনও বাচ্চা ছেলে।

মা বলেছেন, বাবা তুমি বড়ো হলে মুক্তিযুদ্ধে যাবা। এখনও তোমার বয়স হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পুরো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাসাবোর সুমনও সেই ভাষণ শুনে অন্যরকমভাবে বদলে গেছে।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কারণ স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে হলে দরকার দক্ষ জনশক্তি।

সুমনের চোখে আগামী দিনের বাংলাদেশ। ■

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম

বঙ্গবন্ধুর শেষ জন্মদিন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমাদের রয়েছে অনেকগুলো জাতীয় দিবস। এ দিবসগুলো আমরা মর্যাদা সহকারে উদযাপন করি। জাতীয় শিশু দিবস এর মধ্যে অন্যতম। কারণ এ দিবসটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনের বৈভবপূর্ণ নানা ঘটনার কারণে প্রতি বছর উদযাপন করা হয়।

আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চ। ১৯২০ সালের এদিন তিনি তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সদর থানাধীন পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া নামক জলে ডোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মায়ের নাম শেখ সায়েরা খাতুন। তাঁরা বনেদি পরিবারের সন্তান। তাঁর আত্মজীবনীতে এসব তথ্য রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্ব-গ্রাম, গোপালগঞ্জ মহকুমা শহরে, মাদারীপুর শহর, কলকাতাইসলামিয়া কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। বঙ্গবন্ধু সারাজীবনই নির্যাতিত-নিপীড়িত অসহায় মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং অধিকার আদায়ে পাশে থেকেছেন। আজকের বাংলাদেশের তিনিই রূপকার, স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের সকল আন্দোলনেরই তিনি মহানায়ক এবং এদেশের সাধারণ মানুষ ছিল তাঁর সারথি। সারাজীবনই তিনি এদেশের মানুষের স্বরাজপ্রাপ্ত তথা পাকিদের অপশাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম আন্দোলন করেছেন। তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ফসল আজকের সোনার বাংলাদেশ।

তিনি মাত্র ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে ১৩/১৪ বছর পাকিদের জেলে অন্তরীণ ছিলেন। এ

সময় তাঁকে মেরে ফেলার জন্য কত অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তিনি সকল অপচেষ্টা ছিন্ন করে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মাঠঘাটের মানুষ। রাখালদের রাজা। তাঁর জন্মদিন পালন ঘটা করে কোনোদিন সম্ভব হয়নি। বাসায় আয়োজন করা হয়নি কেক কেটে বড়োলোকি আয়োজন।

জাতীয় শিশু দিবস তথা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালনের একটি ছোটো ইতিহাস রয়েছে। আজকাল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালনের কর্মসূচি শুরু হয় তাঁর জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়ার আঙিনা থেকে। কিন্তু পঁচাত্তরের পর তাঁর খুনিরা তাঁর নামটি মুছে ফেলার সমূহ চেষ্টা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মানুষেরা ছিল পতিত। খোনকার, জিয়া ও এরশাদ প্রমুখ খুনিরা তাঁকে ভীষণ ভয় পেত। ১৯৮১ সালের পূর্বে ডাক্তার এস.এ মালেক বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করে প্রথম বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালনের আয়োজন করেন। আমরা ছিলাম তাঁর কর্মী। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে বাদাম টানিয়ে সেবার বঙ্গবন্ধুর গল্প বলেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিশু একাডেমির সভাপতি লাকী ইনাম। এরপর থেকেই বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘর প্রমুখ সংগঠন জন্মদিন পালনে তৎপর হয়।

১৯৮১ সালে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা স্বদেশে ফিরে এলে স্বাধীনতাকামী মানুষ স্বস্তি ফিরে পায়, দিশা পায় গোটা নিপীড়িত মানুষ। ওই সময় ১৯৯৪ সালে শিশু একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আয়োজিত জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. নীলিমা ইব্রাহিমই প্রথম বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন জাতীয়ভাবে পালনের প্রস্তাব করেন। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠকন্যা শেখ রেহানা। এর এক বছর পর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে জনগণের আশা পূরণ হয়। তবে ৫ বছর পরে তা ছেদ পড়ে। কিন্তু বেসরকারিভাবে উদযাপিত হতে থাকে। পরে আবার বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এলে দিবসটি জাতীয়ভাবে উদযাপনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। যা আজও বিদ্যমান।

বঙ্গবন্ধুর শেষ জন্মদিন পালন

বঙ্গবন্ধুর শেষ জন্মদিনটি ছিল ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ। এরপর ওই বছরই আগস্টের ১৫ তারিখ ভোরে একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাঁকে এবং তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে নির্বিচারে হত্যা করে। সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা গোটা বিশ্ব জানে।

হ্যাঁ, ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর (গণভবন) অফিস প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর ভাইবোনদের জন্য এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেয়, কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘর, বয়স্কাউটস ও গার্লস গাইডের ভাইবোনেরা। প্রায় হাজার খানেক ভাইবোনদের সাথে বঙ্গবন্ধু মিশে গিয়েছিলেন সেদিন। প্রত্যেকের খবর নিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে নিজে গেয়েছিলেন–

সে যে মোদের সবার প্রিয়
সকলের আদরণীয়
সকল কাজের বরণীয়
বিভু তোমায় এই মিনতি
দীর্ঘ জীবন তাঁরে দিও
সফল জীবন তাঁরে দিও।

গণভবনের সেই সবুজ চত্বরে নিষ্পাপ ভাইবোনদের মিনতি সফল হতে দেয়নি পঁচাত্তরের খুনিরা। ইতিহাস কত নির্মম। খুনিরা হারিয়ে গেছে। কেউ কেউ গলায় ফাঁসির রজ্জু পরেছে। আর বঙ্গবন্ধু এখন আকাশের নক্ষত্ররাজ। ঐ অনুষ্ঠানে দাদাভাই শওকত আনোয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওই ১৭ই মার্চ শেষ জন্মদিনের সকালে ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাসায় বাংলার বাণী থেকে অর্থাৎ শাপলা কুঁড়ির আসরের ভাইবোনের পক্ষে কথাশিল্পী মাহবুব তালুকদার ও ধিমান ভট্টাচার্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। আরো শুভেচ্ছা জানান একদল ভাইবোন নিয়ে প্রখ্যাত কথা শিল্পী সেলিনা হোসেন। জন্মদিনে আমরাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। জয়বাংলা। ■

বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

স্বাধীনতা

রকিবুল ইসলাম

স্বাধীনতায় আছে সকল সুখ
স্বাধীনতায় হাসে মায়ের মুখ
স্বাধীনতায় দূর হয়ে যায় সব হারানোর দুখ।

স্বাধীনতায় ভীতুরা হয় বীর
স্বাধীনতায় স্বপ্ন করে ভিড়
স্বাধীনতায় উন্নত হয় নতজানু শির।

স্বাধীনতায় পাখিরা গায় গান
স্বাধীনতায় মুক্ত বায়ুর ঘ্রাণ
স্বাধীনতায় মাতৃভূমির উচ্ছ্বসিত প্রাণ।

স্বাধীনতায় করি হুলস্থুল
স্বাধীনতায় ফোটে হাজার ফুল
স্বাধীনতায় ভাসতে থাকে ইচ্ছে নদীর কূল।

অমর হয়ে বেঁচে থাকো

মুনির শফিক

অন্ধকারে একটি বাতি
আলোর পথের দিশা
মুজিব তুমি বঙ্গদেশের
বেঁচে থাকার নিশা।

তোমার হাতে হাতটা রেখে
এল স্বাধীনতা
যার কারণে বীরের বেশে
বলতে পারি কথা।

ধরার বুকে সৃজন হলে
১৭ই মার্চ তুমি
ফুল কলিতে নিয়ে এলে
চেতনার এই ভূমি।

তোমার ত্যাগে বাঙালিরা
আছে ভীষণ সুখে
অমর হয়ে বেঁচে থাকো
বঙ্গদেশের বুকে।

মুক্তিগাথা

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

রেসকোর্সে দিলে ভাষণ তুমি জনতার কবি
সেই ভাষণেই ফুটে উঠেছিল স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি।
নির্বাচিত সরকারকে মসনদ ছাড়েনি পাকিস্তান
পূর্ব-বাংলা জবাব দিয়েছে তাদের করেছে নাস্তান।

উত্তেজিত জনতার মাঠে আসিলেন প্রাণের নেতা
বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বাংলার মুক্তিগাথা।
বাংলার আকাশ প্রকম্পিত সেদিন মুক্তি মুক্তি পণ
নেতার কণ্ঠ তাহাই ঘোষিলো,আজ হতে মুক্ত বঙ্গভূবন।

পলাশির প্রান্তরে অস্তমিত যেদিন বাংলাদেশের সূর্য
নানা কষাঘাতে জর্জরিত জাতির ভেঙে গিয়েছিল ধৈর্য।
উৎপেতে থাকা নির্যাতিত বাংলা পেল চিরমুক্তির দিশা
দীপ্ত কণ্ঠের হুংকার শুনে বাঘা-বাঙালি পেল যুদ্ধজয়ের নেশা।

তোমার কণ্ঠের অমরবাণী 'মুক্তির সংগ্রাম'
বাঙালি করেছে জীবনবাজি দিয়েছে রক্তের দাম।
ইউনেস্কো স্বীকৃত আজ, তোমার ঐতিহাসিক বজ্রবাণী
বঞ্চিত বাংলার বুকে, স্বাধীনতা দিলো আনি।

সেই ভাষণ

দীন ইসলাম

৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর
ঐতিহাসিক সেই ভাষণ
বিশ্ব জুড়ে সবার হৃদয়ে
করে নিয়েছে আসন।

তাঁর বজ্রকণ্ঠের সেই ভাষণে
দিলো আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে
স্বাধীনতা আনতে বীর বাঙালি
যুদ্ধে নামল ঝাঁপিয়ে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে
মিলল প্রিয় স্বাধীনতা
এরই সাথে মুক্ত হলো বাংলার
শিকল বাঁধা পরাধীনতা।

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর দ্বাদশ পর্ব-শেষ অংশ]

এমনি নানান কথা বলতে বলতে ওরা রাজাকার ক্যাম্পে পৌঁছে। ছলিম বুলুকে নিয়ে সোজা চলে যায় কমান্ডারের অফিসে। কমান্ডার বুলুকে দেখে হাসতে হাসতে বলে– ছলিম, এই বুঝি বুলু কাঠুরে? তা বেশ বেশ! মাশাল্লা ফিগার তুমার বুলু। আমি খুব খুশি হইছি তুমি আমাগের সাথে যোগ দেছো বলে। তা তুমার অব্বাজান-আম্মাজান ক্যামন আছে?

কিন্তু কমান্ডারের কথা যেন কিছুই কানে যায় না বুলুর। কমান্ডারের চেহারা দেখে ওর চোখ একেবারে ছানাবড়া। আরে! এ তো গতরাতে স্বপ্নে দেখা সেই চেহারা– ধারালো কুড়ালের কোপে যার মাথা ও দুই ভাগ করে দিয়েছিল! তা হলে গত রাতে ও সত্য স্বপ্নই দেখেছে! তা হলে তো কমান্ডারের নামটাও সত্য হবে– ওর নামটা তো মৌলবী বজলু মিয়া! উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে কাঁপতে থাকে বুলু। কোনো কথা-ই বলতে পারে না মুখে।

কমান্ডার আবার মুখ খোলে, বুলুর কানে তা বোমা ফাটার শব্দের মতোই লাগে– আমার নাম মৌলবী বজলু মিয়া, সবাই বলে বজলু কমান্ডার। ইসলাম আর পাকিস্তান রক্ষার জন্যি মুক্তিগের সাথে ফাইট দিচ্ছি। এতে তুমাগের মতো জোয়ান ছেলেগের সাহায্য খুব দরকার আমাগের। পাকিস্তান না থাকলি আমাগের বাঁইচে থাহে কী লাভ বলো! ওই ব্যাটা মুক্তিরা কী বুঝে যে পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়তিছে, তা ওরাই জানে আর আল্লাহ মাবুদ জানে। তা বুলু, বলো ক্যামন লাগতেছে তুমার?

বুলু ভাবে– ওকে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হতে হবে, পাকা অভিনয় করতে হবে, ওদের কিছুই বুঝতে দেয়া চলবে না। তাই মুখে একরাশ হাসি ফুটিয়ে হাত জোড় করে বলে বুলু–আমারে মাফ করবেন ছার! নতুন জা'গা তো, তাই এট্টু ভয় পা'য়ে গিছিলাম। কিন্তু

আপনার মতো একজন ভালো-মানুষির মিঠে কথায় আমার সে ভয় এহন কাইটে গেছে ছার। আপনি যা কবেন, তাই করব ছার। কাঠ তো কাটবই। যদি কন রাইফেল চালাও, এট্টু শিখায়ে দিলি তা-ও পারব ছার।

বুলুর পাকা অভিনয়ে ছলিমের টাসকি খাওয়ার জোগাড়। ওর মুখে শুধু তৃপ্তির হাসি। বজলু কমান্ডার এবার বলে– সাব্বাস ব্যাটা, সাব্বাস! এই তো খাঁটি ঈমানদারের কথা, সাচ্চা পাকিস্তানির কথা। তুমাগের মতো জোয়ান ছাওয়াল-পাওয়াল যত বেশি বেশি আমাগের সাথে যোগ দেবে, বিচ্ছু মুক্তিগের ঠেকানো ততই আমাগের জন্যি সহজ হবে। আমাগের জেলার বড়ো লিডার মাহবুব সায়েবের আত্মীয় আমাগের ইনফরমার সাদেক বাবাজির কাছে শুনিছিলাম, তুমি ঈমানদার ভালো মানুষ। সাচ্চা পাকিস্তানি। তুমার বাপও ভালো মানুষ। গরিব হ'লি কী হবে, খান্দানি বংশ তুমাগের। তাইতো তুমারে এহানে চাকরি দিলাম। তয় বাবা, বেশিদিন তুমার কাঠ কাটতি হবে না। ভালো একজন কাঠুরে পা'লিই তুমারে আমি রাইফেল চালানো শিখায়ে তুমার হাতে রাইফেল তুলে দেবো। তহন মজা করে মুক্তিগের মারবা।

আবারও ভিম্‌রি খাওয়ার অবস্থা বুলুর। এ-ও তো হুবহু সেই স্বপ্নের মধ্যে শোনা কথা! ও আর নিজেকে সামলাতে পারছে না কিছুতেই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওর জন্য একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই কী করবে, ভেবে না পেয়ে হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ে কমান্ডারের পায়ের ওপর। এতে কমান্ডার আরো খুশি হয়। বলে– থাক থাক, সালাম কত্তি হবে না। বাঁ'চে থাহো বাবা, বাঁ'চে থাহো। দুয়া করি, একদিন তুমিও কমান্ডার হবা। তো ছলিম, দিলুকে তুমার রুমে নিয়ে যাও। তুমাগের সাথেই রাখবা ওরে। দেখবা যেন ওর কোনো অসুবিধে না হয়। আর হ্যাঁ, আজ তুমার কোনো কাজ কত্তি হবে না বুলু। আজ রেস্ট নিবা আর মুজাহিদ ভাইগের সাথে পরিচিত হবা। বিকালে তুমার এপাটমেন্ট (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) লেটার মানে নিয়োগপত্র নিয়ে নিও।

বুলু নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কমান্ডারকে সালাম দিয়ে ওরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তারপর বুলুকে সাথে নিয়ে নিজের ঘরে যায় ছলিম। সেখানে আরো দু'জন আছে ওদেরই সমমনা, অর্থাৎ রাজাকাররূপী মুক্তিযোদ্ধা। কমান্ডারকে খুশি করেই ওরা এক রুমে থাকার ব্যবস্থা করেছে। আর আজকে বুলুর ব্যবস্থা তো কমান্ডারই করে দিলো। এখন সবমিলে ওরা হলো চারজন। বুলুকে দেখে ওরা তিনজন শুধু এক পলক একে অন্যের দিকে তাকালো আর ইশারায় মনের কথা বিনিময় করল। তারপরই ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ছলিম পরিচয় করিয়ে দেয়– রাশেদ, মফিক, এ হলো বুলু ভাই– বুলু কাঠুরে। আমাগের সাথেই যোগ দেছে। আর বুলু ভাই, এরা হলো...

–এরা হলো রাশেদ আর মফিক, তাইতো?– বুলু হাসিমুখে বলে।

ওদের তিন জনেরই বয়স তেরো/চৌদ্দ। ওরা বুলুকে জানায়, ওরা এখনও অস্ত্র হাতে পায়নি, এখনও ওদের ট্রেনিং চলছে। তবে ৩০৩-রাইফেল মোটামুটি চালানো শিখে গেছে। এখন গ্রেনেড ট্রেনিং চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই অস্ত্র নিয়ে অপারেশনে যেতে হবে। ওদের ক্যাম্পের দিন শেষ হয়ে এল বলে।

তখন বুলু বলে–ছোটো ভা'ডিরা, তুমরা আমারেও রাইফেল চালানো শিখাবা। দিনের বেলা কাঠ কাটব আর রাত হ'লি তুমাগের কাছে রাইফেল চালানোর কৌশল শিখব। আমি এট্টা লাম্বা কাঠ নিয়ে আসব, তুমরা সেই কাঠ ধরেই আমারে শিখাবা। তারপর তুমরা অস্ত্র পা'লি তো কথাই নেই। কী, পারবা না? মনে রা'খো, তুমাগের টেরনিং শেষ হ'লিই কিন্তু যুদ্ধে যাতি হবেনে মুক্তিবাহিনী মানে আমাগের নিজেগেরই বিরুদ্ধে। তা কি তুমরা পারবা? পারবা না। আর এ জন্যিই তো তোমাগের তৈরি হ'তি হবে, যাতে মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষে অপারেশন চালানোর আগেই ওগের উপর অপারেশন চালানো যায়। শোনো, আমাগের মূল কাজ কিন্তু রাজাকারগের সব খবর আর পিলান মুক্তিযোদ্ধাগের জানানো। সেইসাথে অস্ত্র চালানো শেখাডাও হয়ে যাচ্ছে। ইডা হলো উপরি-পাওনা। পরে এই টেরনিং অনেক কাজে লাগবেনে। ওগের অস্ত্র দিয়েই আমরা টেরনিং নেবো। আবার সুযোগমতো সেই অস্ত্র ওগের উপরই ছোড়ব।

এ যেন পুঁটির তেলে পুঁটি ভাজা! তুমরা যদি আমারে শিখায়ে নিতি পারো তো আমি আগায়ে থাকলাম। আর সত্যিকার টেরনিংয়ের সুযোগ পা'লি তো কথাই নেই।

বিলুর কথা ওরা মন দিয়ে শোনে। এবার মফিক বলে– বুলু ভাই ঠিকই কয়েছে। আমরা কোনোদিনও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তাই ট্রেনিং শেষ হওয়ার আগেই এট্টা উপায় কত্তি হবে। বুলু ভাই তুমি আমাগের মুরব্বি। তুমিই উপায় চিন্তা করবা।

বুলু আশ্বাস দেয়– সে উপায় বের করবে।

ওরা দুপুরের খাবার খায়। তবে অন্য তিন জনের মতো বুলুও গোশত খেলো না। শুধু সবজি আর ডাল দিয়ে ভাত খেলো। মানুষের বাড়ি থেকে লুট করে আনা গরু-ছাগলের গোশত মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওরা ছোবে কেন! মফিক আর রাশেদ প্রথম যেদিন রাজাকার ক্যাম্পে যোগ দেয়, সেদিন ওরা বলেছিল গোশত খেলেই ভয়ানক এলার্জি হয়। ছলিম বলেছিল পেট ব্যথা করে। রান্নার দায়িত্বে থাকা লোকেরা খুবই খুশি হয় এতে। এ নিয়ে কাউকে কিছু বলে না তারা। ওদের গোশতের তিনটি বাটি ওরা কৌশলে সরিয়ে রাখত নিজেদের জন্য। আজ বুলুও গোশতের বাটি নিলো না। গোশত খেলে ওর না কি কঠিন ডায়রিয়া হয়। চার-চারটা ছেলে এক ঘরে থাকে, চারজনই গোশত খায় না– বিষয়টা বেশ গোলমেলে হলেও রান্নার লোকেরা বাড়তি গোশত পাওয়ার লোভে তা বেমালুম চেপে যায়।

বিকেলে বুলু বলে– ভাই ছলিম, চলো নিয়োগপত্রটা নিয়ে আসি। তারপর অন্যদের সাথেও মোলাকাত হবে।

ছলিম বলে– বুলু ভাই, এহন আমাগের ট্রেনিং আছে। তুমি একলা যাও। নিয়োগপত্রডা নিয়ে তুমি ট্রেনিংয়ের মাঠে আসো। ট্রেনিং দেখতি পারবা।

বুলু চলে যায়। কমান্ডারের অফিসে গিয়ে দেখে সেখানে বসে আছে সাদেক ভাই। কমান্ডার তার সাথে খুব খাতির করে কথা বলছে। তাকে চা-বিস্কুটও খেতে দিয়েছে। বুলুকে দেখেই কমান্ডার খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে– এইযে, এইযে আমাদের বুলু মিয়া আইসে গেছে। সাদেক সায়েব, এইযে আপনার বুলু। খুব ভালো ছেলে। আরে, আপনার পছন্দ কী খারাপ হতি পারে, সাদেক সায়েব? তো, আসো আসো বুলু, এই ন্যাও তুমার 'এপাটমেন্ট' লেটার। বিসমিল্লাহ্ ক'য়ে নিও। বরকত হবেনে।

নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে বুলু লম্বা একটা সালাম দেয় সাদেক ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। কমান্ডার তা দেখে মহাখুশি। বড়ো লিডার মাহবুব সাহেবের আত্মীয় সাদেক সাহেবকে সালাম দিলে তার কী আর বাকি থাকে! সাদেক সাহেব খুশি থাকলে তো তার উন্নতি– এসব ভাবতে ভাবতে সাদেকের দিকে তাকায় কমান্ডার। তারপর খুশিতে হে হে করে হাসতে থাকে। সাদেকও মিষ্টি করে হাসে. তারপর বলে– সবদিকে ভালোভাবে নজর রাখবেন কমান্ডার সাহেব। মুক্তিরা কিন্তু আপনাদের কাছাকাছিই আছে। সাবধান থাকবেন। আর যে-কয়টা চোর-চোট্টা-বদমাশ ক্যাম্পে আছে, ওরা যেন বেশি বাইরে না যায়। নির্দোষ মানুষদের যেন আর হত্যা না করা হয়। ওই বদমাশগুলোর জন্য 'আমাদের বাহিনীর' খুব বদনাম হয়ে যাচ্ছে।

কমান্ডার জি আচ্ছা, জি আচ্ছা বলে হে হে করে হাসতে থাকে। সাদেক বজলু কমান্ডারের এবারের হাসির কোনো কারণ খুঁজে পায় না। তাই আর কোনো কথা না বলে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে, বুলু দাঁড়িয়ে আছে। সাদেক ওর দিকে শুধু মিষ্টি করে হাসে আর চোখ ইশারায় কী যেন বলে। ও সেই ইশারার মানে বোঝে। কোনো কথা না বলেই তাই ও চলে যায় ট্রেনিং গ্রাউন্ডের দিকে।

পরদিন বুলু কাঠ চেরাইয়ের কাজে লেগে গেল। বাড়ি থেকে খবর পেয়েছে, মিয়াজি নিজেই ওদের বাড়ি এসে ওর মায়ের কাছে পাওনা টাকাটা দিয়ে গেছেন। এদিকে সাদেক ভাইও ওদের বাড়ি এসে কিছু টাকা দিয়ে গেছে এবং বলে গেছে, ছোটো কেনাকাটা সিরাজ আলির দোকান থেকে সারতে আর সাপ্তাহিক বাজারের ব্যবস্থা ও নিজেই করবে। বুলু বাবা-মায়ের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়। তবে কাঠ চেরাইয়ে তার মন বসে না। ওর মন কেবলই ছুটে যায় রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর বিচ্ছুদের কাছে, যারা জীবন বাজি রেখে

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। মনের চোখে ও যেন দেখতে পায়, ওর বিশাল কুড়ালটা এরই মধ্যে একটা রাইফেল হয়ে গেছে। আর শত্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে সেই রাইফেলের ট্রিগার টিপছে ট্যা-ট্যা-ট্যা– অনবরত, অবিশ্রান্ত।

এভাবেই দিন যায়। বুলু কাঠ কাটে আর ঘোরের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ করে– রাইফেল চালায়। এরই মধ্যে কমান্ডার ওকে এক বেলা কাঠ চেরাই করতে আর বিকেলে সবার সাথে ট্রেনিংয়ে অংশ নিতে দিয়েছে। ছলিম-মফিক-রাশেদের ট্রেনিং এরই মধ্যে শেষ। বুলু সময় কম পেলেও দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে ওর। ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে যারা আছে, তাদের ভাষায়– বুলুর মতো এত তাড়াতাড়ি এ ক্যাম্পে কেউই রাইফেল আর গ্রেনেড চালানো শিখতে পারেনি। ওকে এখনই অপারেশনে পাঠানো যায়। কমান্ডারও এ খবর শুনে খুব খুশি। বুলুকে যুদ্ধে পাঠাতে তিনিও খুব আগ্রহী।

জুলাই মাসের এক সন্ধে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঝম ঝম ঝম বৃষ্টির একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যেয় মায়ের কাছে রূপকথার গল্প শোনা বুলুর বহুদিনের অভ্যেস। কিন্তু আজকের সন্ধেয় শুনছে এক ভিন্ন গল্প। নিজের বাড়িতে মায়ের কাছে বসে নয়, রাজাকার কমান্ডার বজলু মিয়ার অফিসে বসে শুনছে সেই গল্প, যার জন্য রাজাকার সেজে এখানে ঢুকেছে।

বজলু কমান্ডার তার ডেপুটি কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার এবং আট/দশজন হোমরাচোমরা রাজাকারকে নিয়ে একটা জরুরি মিটিংয়ে বসেছে তার অফিসে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মিটিংয়ে আরও যোগদানের সুযোগ পেয়েছে বুলু ও ছলিম। সবাইকে লক্ষ্য করে কমান্ডার বলছেঃ ভাইসব, আমাদের বিশ্বস্ত ইনফরমার সাদেক সায়েবের কাছে খবর আছে, পরশু ভোর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা আমাগের ক্যাম্প আক্রমণ কত্তি আসবে। আগামীকাল সারাদিন এবং রাতে তারা ইন্দ্রে প্রাইমারি ইস্কুলে থাকবে। তারপর সেখান থেকে অ্যাডভান্স করে আমাগের উপর হামলা করবে। সাদেক সায়েব পাকা মানুষ। এই দেখো, ওগের প্ল্যানের এট্টা ম্যাপও যোগাড় করে আমারে দিয়ে গেছেন।

সবাই আগ্রহের সাথে ম্যাপ দেখতে থাকে। বুলু আর ছলিমও দেখে। আসলে এ যে বাবু ভাই-সাইদ

ভাইদেরই পাতা একটা ফাঁদ, তা বুঝতে বাকি থাকে না ওদের। বুলু বলে: ছার, এবার মুক্তিগের সাথে ফাইট দেয়ার এট্টা সুযোগ পাবো বলে ভারি খুশি লাগছে। পরাণ পাখিডা খুশিতে খালি ঝাপট মাত্তেছে। আপনার কথা শুনে তো আমার মনে হচ্ছে, এহনই রাইফল নিয়ে ছুটে যাই। কিন্তু তা তো করা যাবে না। যুদ্ধের সিস্টেম আছে না?

বুলুর কথা শুনে কমান্ডার হে হে করে হাসে খানিকক্ষণ। তারপর বলে–সাব্বাস বুলু মিয়া! সাব্বাস বীর মুজাহিদ! সবারই এ রকম সাহস আর হিম্মত চাই। তা হ'লি মুক্তিরা কনে উড়ে চলে যাবেনে তার ঠিক আছে! তা, এখন প্ল্যান ঠিক করা যাক। আমার মনে হয়, আগামীকাল রাত নয়টার সময় আমরা ইন্দ্রে ইস্কুল আক্রমণ করব। ওরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকপেনে, আর আমরা আচমকা ব্রাশ ফায়ার করে আর গ্রেনেড ছুড়ে ওগের এহেবারে ভ্যানিশ করে ফ্যালব। এ অপারেশনডা আমি নিজিই কমান্ড করব–এমন গোছানো টার্গেট আর পাবো না। আমার সাথে থাকবেন ডেপুটি কমান্ডার তারেক সায়েব আর জন-পঞ্চাশেক রাজাকার মুজাহিদ। এর বেশি লাগবে না, কী বলেন আপনারা?

ডেপুটি কমান্ডার বলে– কমান্ডার সায়েব ঠিকই কয়েছেন, এর বেশি মুজাহিদ লাগবে না। আসলে তো ইজি টার্গেট। সবাই ইস্কুলির মধ্যি ব্যস্ত থাকবেনে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে, হয়ত দুই-চারজন পাহারায় থাকবে। এই টার্গেট ফিনিশ করা তো পাখি মারার মতো সহজ।

মিটিংয়ের মধ্যেই অপারেশনের একটা নকশা আঁকা হলো, তাতে রাজাকারদের অবস্থানও চিহ্নিত করা হলো। বুলু আর ওর তিন সাথিও প্রথম বারের মতো ইন্দ্রা স্কুল অপারেশনে অংশ নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তবে ওরা নতুন বলে ওরা থাকবে একেবারে পেছনে; বলা যায়, এটা শুধু ওদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একটা সুযোগ।

ঘণ্টা-খানেক পর মিটিং শেষ হয়। বৃষ্টি তখন অনেক কমে এসেছে। হঠাৎ বুলুকে দেখা যায় কমান্ডারের টেবিলের সামনে মুখ কাচুমাচু করে কী-যেন বলতে। কমান্ডার সাথে সাথে হে হে করে হেসে ওঠে, তারপর বলে– বাড়ি যাবা বাবা-মাকে টাকা দিতি, তার জন্যি এত কাচুমাচু কেন? তবে একলা যাবা না। ছলিমরেও সাথে নিয়ে যাও। খুব সাবধানে যাবা। রেইন কোট পরে যাও, কেউ দেখলিও অন্ধকারে চিনতি পারবে না। যাও, আল্লাহ হাফেজ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

বুমে এসেই ওরা চার জন সামান্য শলা-পরামর্শ করে। তারপর রেইন কোট পরে বুলু আর ছলিম ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়। একটু দূরে যেতেই কথা বলে ছলিম– বুলু ভাই, এহন সাদেক ভাইরে কনে পাবানে?

–আজ বৃষ্টি হচ্ছে, মনে হয় বাড়িতিই পাওয়া যাবেনে তারে।–বুলু ছলিমকে আশ্বস্ত করতে চায়।

আনুমানিক আধা চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ওরা সাদেক ভাইদের বাড়ি পৌঁছে যায়। দেখে সাদেক ভাইয়ের ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। বাড়িতে আর কেউ আছে কি না, বোঝা যায় না। বারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছলিম চাপা গলায় বলে: সাদেক ভাই, ঘরে আছেন?

সাদেক ভাই সহজ গলায় বলে– আয়।–যেন ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল সে।

বুলু আর ছলিম ঘরে ঢোকে। খাটের ওপর বসেই বুলু রাজাকারদের সব প্ল্যানের কথা খুলে বলে। তারপর জিগ্যেস করে: সাদেক ভাই, সত্যি কি ওইদিন মুক্তিযোদ্ধারা ইন্দ্রে ইস্কুলি থাকপেনে?

সাদেক ভাই হাসতে হাসতে বলে– পাগল নাকী! ওই রাজাকার কমান্ডার আস্ত একটা ছাগল। আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা হলো বোকা পাঁঠা। আমি যা বললাম, ওরা তাই-ই বিশ্বাস করল। আসলে আমরা ওদের ক্যাম্পের বাইরে এনে মওকামতো নিকেশ করতে চাই, বুঝলি?

বুলু আর ছলিম একসাথে মাথা নাড়ে, মানে তারা বুঝেছে। সাদেক ভাই আবার বলে– ওইদিন রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর সাথে আমিও থাকব। আমরা ওদের পথের মধ্যেই মেশিন গান-এলএমজির ব্রাশ ফায়ারে খতম করে দেবো। সাথে আরো অস্ত্র তো থাকবেই। ওরা হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে মরবে, আর্তচিৎকার করবে; আর আমরা কিছুক্ষণ ওই বেইমান মীরজাফরদের ধ্বংস দেখব দুই চোখ ভরে।

কিন্তু... কিন্তু আমি ভাবছি তোদের নিয়ে। তোরাও তো থাকবি ওদের সাথে। ব্রাশ ফায়ার তো তোদেরও...

সাদেক ভাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বুলু বলে– সে-কথা আমি আগেই ভা'বে রাহিছি সাদেক ভাই। আমরা কেবল টেরনিং শেষ করিছি, এহেবারে নতুন আমরা। তাই ডিপুটি কমান্ডারের পিলানমতো আমরা থাকপো এহেবারে পিছনে। তা হ'লি বোঝো, সুযোগমতো পিছন থে' কাইটে পড়া কি কঠিন কাজ?

সাদেক ভাই হেসে বলে– বুলু, তুই খুবই ব্রিলিয়ান্ট! তোর কাছে অসম্ভব কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। তো শোন, ইন্দ্রার মাঠের মধ্যে একটা ছোটো কালভার্ট আছে না রাস্তায়? কী যেন নাম– ওঃ আঙ্কুরোর পুল। ওখানে রাস্তার দু'পাশে ঘন ঝোপজঙ্গল। এ ছাড়া দু'দিকে আমন ধানের খেত। পানিতে টইটম্বুর। রোয়া-ধানের কালো কালো ঝাড়গুলো অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। পাটের ক্ষেতও আছে কয়েকটা। বাবুর বাহিনী সন্ধ্যের আগে-আগেই সেই ঝোপ-জঙ্গল আর ধান-পাটের ক্ষেতে পজিশন নেবে। এখান থেকেই আমাদের অস্ত্র গর্জে উঠবে। বুলু, ছলিম, সাবধান! সেভাবেই বুঝে-সুঝে তোরা পাশের ধান বা পাটের খেতে নেমে পড়বি। অপারেশন শেষ হওয়ার পর তোরা আমাদের সাথে মিশে যাবি। আমরা চারজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা আর চারটে নতুন অস্ত্র পাবো, তাই না?

সাদেক ভাইয়ের মুখে বিজয়ের হাসি। বুলু আর ছলিমের মুখেও হাসি।

এখন ওদের ক্যাম্পে ফেরার পালা। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বুলু আমতা আমতা করে বলে: তা হ'লি সাদেক ভাই, আমার ওই স্বপ্নের বাকিটুকু সত্যি হবেনে কীভাবে... ওই যে, কুড়োলির কোপে কমান্ডারের মাথা দুই ভাগ করে ফেলা... এরপর বুলু সেই স্বপ্নের সব কথা খুলে বলে সাদেক ভাইয়ের কাছে। তখন সাদেক ভাই বুলুর হাত ধরে বলে– বুলু, স্বপ্ন তো স্বপ্নই। সত্যি হতেও পারে আবার নাও পারে। তবে তোমার স্বপ্ন অর্ধেকটা তো সত্যি হয়েই গেছে; মানে কমান্ডারের নাম মৌলবী বজলু মিয়া এবং তোমার হাতে রাইফেল উঠেছে– এ পর্যন্ত তো সত্যি হয়েছে! আর বাকিটাও না হয় পুরোটা সত্য না-ই হলো! আরে বুলু, কমান্ডার মরলেই তো হলো, নাকি? এলএমজির গুলি না কুড়ালের কোপে মরল, এতে কী এসে যায়!

আজ সেই কথিত ইন্দ্রা স্কুল অপারেশনের স্মরণীয় দিন। বুলু আর ওর তিন সাথির জীবনেও এটি চিরস্মরণীয়। আজই ওদের প্রথম যুদ্ধযাত্রা। তবে ওরা ভুলেও মনে করছে না যে, ওরা রাজাকার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছে। তাই মনটা ওদের বেশ ফুরফুরে।

> ৩০৩ রাইফেল মোটামুটি চালানো শিখে গেছে। এখন গ্রেনেড ট্রেনিং চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই অস্ত্র নিয়ে অপারেশনে যেতে হবে। ওদের ক্যাম্পের দিন শেষ হয়ে এল বলে।

সন্ধ্যের আগে-আগেই মুক্তিযোদ্ধারা আঙ্কুরোর পুলের আশপাশে পজিশন নেয়। কেউ রাস্তার ঢালুতে, কেউ রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে বড়ো বড়ো বাবলা গাছ, তালগাছ আর পাকুড় গাছের আড়ালে। ওদের সাথে রয়েছে একটা মেশিন গান, বেশকিছু এলএমজি, চাইনিজ রাইফেল, ৩০৩ রাইফেল আর গ্রেনেড। প্রয়োজন মনে না হওয়ায় কোনো ডিনামাইট ফিট করা হয়নি। আমি অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছি, ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে রয়েছে সাইদ।

এদিকে 'বিশ্বস্ত ইনফরমার সাদেক সায়েবের' পরামর্শমতো রাজাকার বাহিনী রওনা দেয় সন্ধ্যের একটু পরেই। পথ খুব বেশি না, মাইল-দেড়েক হবে। ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড, সাধারণ মানুষ যাকে

শের শাহ রোড বলে– সেই কাঁচা রাস্তা ধরে রাজাকার বাহিনী হেঁটে রওনা দেয় উত্তর দিকে ইন্দ্রা স্কুল বরাবর। রাজাকার বাহিনীর সবার অগ্রভাগে বজলু কমান্ডার, কিছুটা পেছনে ডেপুটি কমান্ডার তারেক, তারপর অন্য রাজাকারেরা। সবার পেছনে চারজন নতুন রাজাকারের সাথে চারজন রাজাকারবেশী মুক্তিযোদ্ধা। কমান্ডার, ডেপুটি কমান্ডার আর অন্য রাজাকারেরা ভারি মৌজে আছে 'মুক্তিদের' সহজে খতম করার আশায়। এর আগে তারা যেকটি অপারেশন করেছে, তার একটিতেও জিততে পারেনি, প্রতিটিতেই ধোলাই খেয়েছে; ওদের বহু 'মুজাহিদ' মারা গেছে সেসব অপারেশনে। কিন্তু এই অপারেশনটি অন্যরকম। একেবারেই রেডিমেড– সাজানো-গোছানো। এক ঘরের মধ্যেই সবগুলোকে ইঁদুরের মতো পিষে মারা যাবে– এমন স্বপ্ন ওদের মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। তাই বেশি তাড়াহুড়ো নেই। রাত আটটা-সোয়া আটটার মধ্যে টার্গেটস্থলে পৌঁছে ভালোমতো পজিশন নিতে ওদের কোনো অসুবিধা হবে না।

সময়মতোই ওরা পৌঁছে যায় আঙ্কুরোর পুলের কাছাকাছি। এদিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুলু, রাশেদ, মফিক আর ছলিমের পায়ে নাকি ভীষণ ব্যথা করছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। রাইফেলের ভার বহন করাই যেন কষ্ট হয়ে পড়ছে! এদিকে অন্ধকারও বেশ গাঢ়। পনেরো-বিশ হাত দূরের কিছু ঠাহর করা কষ্ট। আসল চার তরুণ রাজাকার বুলুদের সাহায্য করতে চায়, কিন্তু বুলু বলে– তুমরা আগায়ে যাও, আমরা আসতিছি। আমরা এহানে বসে এট্টু জিড়ায়ে নিই। নতুন তো, তাই বুট প'রে এতদূর হাঁ'টে পায় এট্টু ব্যথা কত্তেছে। এট্টু জিড়ায়ে নিলিই ঠিক হয়ে যাবেনে। তুমরা সাহায্য কত্তি চাচ্ছো, এর জন্যি তুমাগের অনেক ধন্যবাদ। এই বড়োজোর পাঁচ মিনিট, তার পরেই তাড়াতাড়ি মার্চ করে চলে আসবানে। যাও তুমরা ভা'ডিরা।

ওরা চারজন এরই মধ্যে রাস্তা থেকে নেমে পশ্চিম-উত্তর দিকে কোনাকুনি হাঁটা ধরেছে। গাঢ় অন্ধকার হলেও বিলটি তাদের কাছে পরিচিত। তারপরও আলপথে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। ওদের এখনকার গন্তব্য কচুদহের শকুনির বটতলা।

ওরা পথ চলছে ঠিকই, কিন্তু কান রয়েছে গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের দিকে, সুন্দর এক কানফাটানো শব্দের আশায়। পাঁচ মিনিটও পার হয়নি। হঠাৎ সেই শব্দ– প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ। ট্যা-ট্যা-ট্যা, গুড়ুম-গুড়ুম ইত্যাকার শব্দ চারদিকের গাঢ় অন্ধকারকে আরো রহস্যময় ও ভয়াবহ করে তোলে। তার মধ্যেই ওরা এগিয়ে চলে কচুদহের দিকে।

অনুমান পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর গোলাগুলি থেমে যায়। মুক্তিবাহিনীর চল্লিশ জনের মধ্যে সবাই পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কচুদহের বটতলায় ফিরে আসে। তবে এদের মধ্যে তিন জন মুক্তিযোদ্ধা বেশ আহত, ওদের এক্ষুনি চিকিৎসা দরকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজন আমার কাছে এসে রিপোর্ট করল– তারা রাজাকার কমান্ডার বজলু আর জনা-চল্লিশেক রাজাকারের মৃতদেহ রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখে এসেছে। টর্চের আলোয় কমান্ডারকে চিনতে ওদের কোনো ভুল হয়নি। গুরুতর আহত অল্পবয়স্ক চার রাজাকারকে ওরা ধরেও নিয়ে এসেছে। ওই যে, ওইদিকে–আঙুল দিয়ে সামান্য দূরে ইশারা করে আমাকে দেখায় তারা।

আমি অন্যদের সাথে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেদিকে যাই। গিয়ে দেখি, আহতদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইফেল-হাতে আরও চারজন, ওরা রাজাকার বাহিনীর পেছনের সারির সেই চার তরুণ রাজাকারকে দেখছে। আমি এবং অন্যরা সাথে সাথে সাবধান হয়ে যাই আর সেদিকে অস্ত্র তাক করে আচমকা চিৎকার করে বলি– হ্যান্ডস আপ!

ওরা চার জন রাইফেল মাটিতে রেখে হাত উঁচিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ এ কার গলা!– বাবু ভাই, আমরা মানে আপনাদের চার রত্ন – রাশেদ, মফিক, ছলিম আর এই আমি– বুলু কাঠুরে!

আমি ওদের সবাইকে আদর করি। বলি– মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তোমাদের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। কে বলে তোমরা রাজাকার! তোমরা মহান মুক্তিযোদ্ধা। আজ থেকে তোমারাও হলে আমার রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর সদস্য আর বিচ্ছুসংখ্যা হলো বিশ থেকে চব্বিশ। ■

শিশুসাহিত্যিক

গল্প

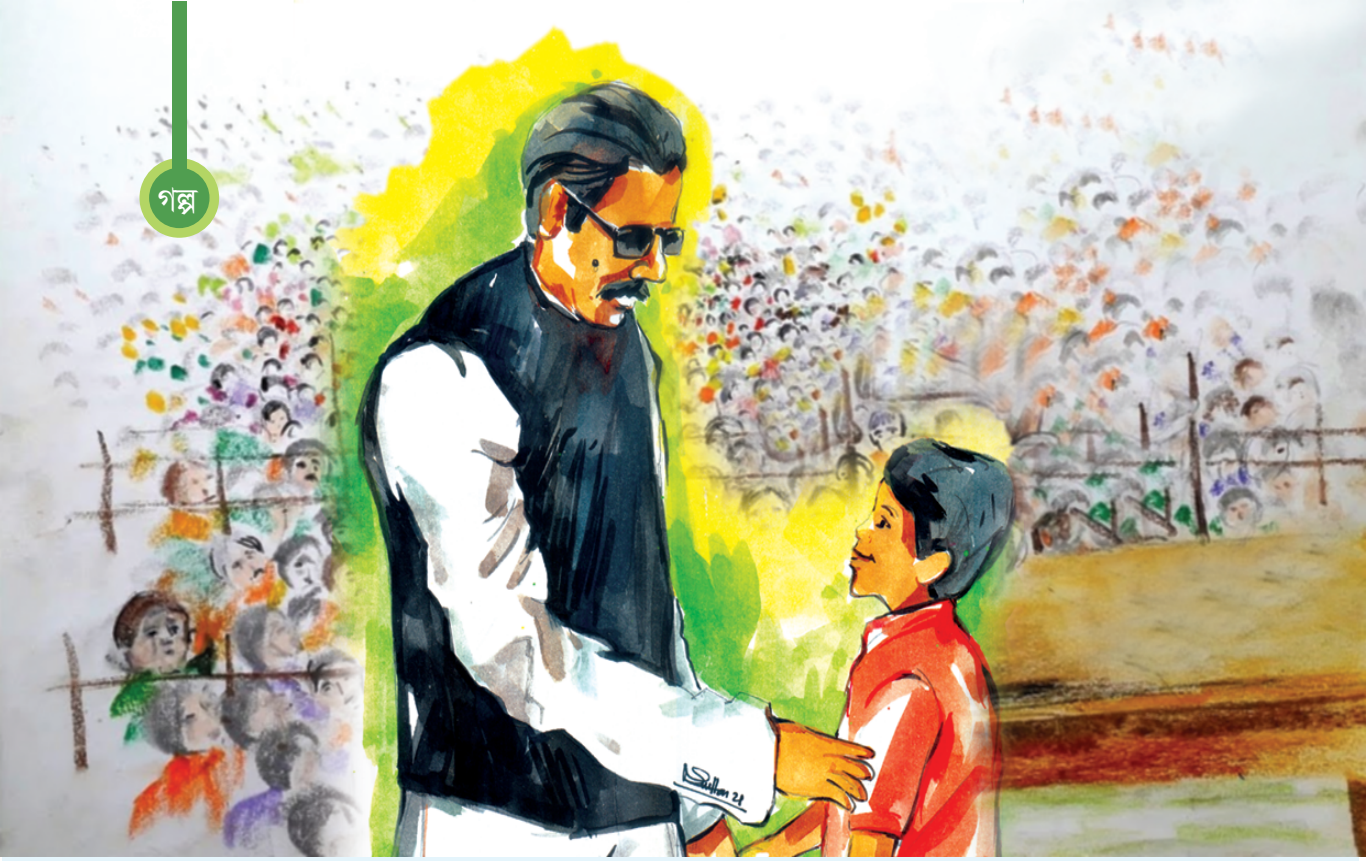

বঙ্গবন্ধুকে দেখা

ইমরান পরশ

তখন উনসত্তর সাল। সারাদেশ টালমাটাল। উনসত্তরের আন্দোলন চলছে। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলায় গিয়ে গণসমাবেশ করছেন। তুমুল জনপ্রিয় তিনি। পুরো পূর্ববঙ্গ জুড়ে একটাই নাম শেখ মুজিবুর রহমান। এদিকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি এক জনসভায় তোফায়েল আহমেদ ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু উপাধি। বঙ্গবন্ধু সবাইকে একত্রিত করতে ছুটে বেড়াচ্ছেন। কি হবে। কি করবেন বঙ্গবন্ধু। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ অত্যাচারে অতিষ্ঠ পূর্ববাংলার জনগণ। পাকিস্তানের সবখানেই বৈষম্য। বঙ্গবন্ধু তারই প্রতিবাদ করছেন। বৈষম্য দূর করতে না পারলে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা দিতে হবে। জনগণের নেতা বঙ্গবন্ধু। তিনিই ত্রাতা হয়ে এসেছেন। কোথায় যাবে দেশ? '৬৬ তে ছয় দফা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

ছয় দফায় নাকাল পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে ঢাকা থেকে খুলনা, যশোর যাবেন। কানাঘুষা চলছে মানুষের ভেতর। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজ মাঠ। বড়ো করে প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে। বাঙালির প্রিয় নেতা আসবেন। সকাল থেকেই অপেক্ষা। হাজার হাজার মানুষ। দুপুরের পরই লোকে লোকারণ্য। লোকে থইথই। তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখতে কত মানুষ এসেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। বাবার হাত ধরে এসেছে আলিফ। সে বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখবে। সকালেই বাবার সাথে এসেছে সভার মাঠে। আলিফের বাবা মুড়ি আর গুড় পোটলা বেঁধে নিয়ে এসেছে। অনেক দূরের পথ। আর জনসভায় কী খাবে। কোত্থেকে খাবে সেই ব্যবস্থা করেই নিয়ে এসেছে সাথে করে। সামনের সারিতে বসে আছে তারা । বঙ্গবন্ধু আসবেন। কখন আসবেন সেই অপেক্ষা সবার।

এর মাঝে হুইসেল বাজিয়ে গেল একদল লোক। সবাই

বুঝল বঙ্গবন্ধু আসার সময় হয়ে গেছে। এরা নিরাপত্তাকর্মী। তারা সংকেত দিলো। বঙ্গবন্ধুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলছে। রাস্তার দুইপাশে জনতা হাত বাড়িয়ে আছে। কারো হাত বঙ্গবন্ধুর হাতে ছোঁয়া লাগছে। সেই হাতে চুমু খাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া পেয়েছে এটা তার কত বড়ো সৌভাগ্য! বঙ্গবন্ধু আসছেন। চারদিকে জয়বাংলা ধ্বনি। কেউ কেউ স্লোগান দিচ্ছে বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মঞ্চে এলেন। হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন সকলের উদ্দেশে। উপস্থিত জনতা করতালি দিয়ে স্বাগত জানালেন বঙ্গবন্ধুকে। আলিফ তার বাবার কাছ থেকে ছুটে যেতে চাইছে। সে বঙ্গবন্ধুকে দেখবে খুব কাছ থেকে। বঙ্গবন্ধু আসার পরই অনেক লোক সামনের সারিতে বসে পড়লেন। ছোট্ট আলিফ আর দেখতে পাচ্ছে না।

বঙ্গবন্ধু দেখতে কেমন? লম্বা নাকি বেটে? বাবাকে জিজ্ঞেস করল আলিফ।

বঙ্গবন্ধু অনেক লম্বা হ্যান্ডসাম ব্যক্তি বাবা?

দেখতে তো পারছি না।

ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে চায় আলিফ। ছোটো মানুষ কেমনে যাবে? তবুও বাবার হাত ধরে এগোতে থাকে। যেতে যেতে একেবারে সামনের সারিতে তারা। আলিফ হাত নাড়ে। বঙ্গবন্ধুর নজর আনতে চায়। কিন্তু এত মানুষের ভিড়ে কেমনে দেখবেন বঙ্গবন্ধু। আলিফ নাছোড়বান্দা। সে জোরে চিৎকার করে বঙ্গবন্ধু...।

নিরাপত্তারক্ষিরাও চমকে ওঠে। বঙ্গবন্ধু ঠিকই তাকালেন। কাউকে ইশারা দিলেন। কেউ একজন এসে কোলে করে আলিফকে নিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু মাথায় হাত রাখলেন।

বড়ো হও বাবা। অনেক বড়ো।

বঙ্গবন্ধু কত বড়ো হবো? তোমার মতো?

তুমি আমার চেয়ে বড়ো হবে। অনেক বড়ো। আলিফের চিবুক ধরে আদর করে দেন বঙ্গবন্ধু। আলিফ মহাখুশি। বাবার কাঁধে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো আলিফ। ■

শিশুসাহিত্যিক

ছোট্ট খোকা

প্রজীৎ ঘোষ

আমি একটি ছোট্ট খোকা
আকাশ সমান মন;
দেশ ও দশের কল্যাণেতে
বিলাবো জীবন।

সত্য পথে থাকব সদাই
করব ভালো কাজ;
আমার ভালো কাজের মাঝে
থাকবে নাকো লাজ।

মা মাটি আর মাতৃভাষার
করব গুণগান;
প্রয়োজনে বিলিয়ে দিবো
আমার ছোট্ট প্রাণ।

মা মাটি দেশ

মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান

দেশকে ভালোবাসি আমি
দেশকে ভালোবাসি
দেশের মানুষ আর
হাজার ফুলের হাসি-
দেশকে ভালোবাসি।

মাকে ভালোবাসি আমি
মাকে ভালোবাসি
মায়ের দুঃখে কাঁদি আমি
মায়ের সুখে হাসি-
মাকে ভালোবাসি।

চাঁদকে ভালোবাসি আমি
চাঁদকে ভালোবাসি
চাঁদের বুকে কলঙ্ক দাগ
দুঃখ অবিনাশী-
চাঁদকে ভালোবাসি।

সবুজ ভালোবাসি আমি
সবুজ ভালোবাসি
সবুজ শ্যামল তরুলতা
ফুল-ফসলের হাসি-
সবুজ ভালোবাসি।

ফুলকে ভালোবাসি আমি
ফুলকে ভালোবাসি
ফুলের বুকে লুকিয়ে থাকা
সুবাস রাশি রাশি-
ফুলকে ভালোবাসি।

মাটি ভালোবাসি আমি
মাটি ভালোবাসি
মাটির বুকে সোনার ফসল
গাঁয়ের রাখাল-চাষি-
মাটি ভালোবাসি।

মাটির টানে

সোহানা আকতার

মাটির মায়ায় টানে আমায়
মাটির গন্ধে মন আকুল
এই মাটিতে জন্ম নিয়ে
ধন্য জীবন হৃদয় ব্যকুল।
এই মাটিকে ভালোবেসে
আমার বেড়ে ওঠা
এই মাটির লতায় পাতায়
আমার স্বপ্ন ফোটা ।
শিমের ক্ষেতে, মটর ক্ষেতে
শিশির ভেজা পথে
মুঠি মুঠি শাক তুলেছি
মেঠো পথে যেতে।
কদম কেয়া তরুলতা
হিজল ফুলে ফুলে
রক্তের সাথে মিশে আছে
থাকা যায় কি ভুলে।

আমার প্রিয় স্বাধীনতা

নুসরাত জাহান

স্বাধীনতা আমার প্রাণের স্বাধীনতা
ত্রিশলাখ শহিদের রক্তে রাঙানো এই স্বাধীনতা
দুইলাখ মা-বোনের সম্মান হারানোর এই স্বাধীনতা
নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে অর্জিত এই স্বাধীনতা
সীমাহীন কষ্ট আর ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা
বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন এই স্বাধীনতা
বঙ্গবন্ধুর গভীর দেশপ্রেম আর স্বপ্নে বোনা এই স্বাধীনতা
আমাদের জীবনে অমূল্য এই স্বাধীনতা।

স্মৃতিতে মার্চ চেতনায় বঙ্গবন্ধু

মুহা শিপলু জামান

বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে মার্চ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। ঘটনাবহুল এই মাস বাঙালির স্মৃতিবিজড়িত যা আমাদের চিন্তা, চেতনা ও অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে।

১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলায় বাবা-মা আদর করে তাঁকে ডাকতেন খোকা, নামটি রেখেছিলেন তাঁর মাতামহ। ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট খোকা একদিন হলেন বাঙালির বড়ো নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর শেখ মুজিবুর রহমান থেকে বঙ্গবন্ধু; এবং সব শেষে জাতির পিতা; স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। সকালের প্রথম সূর্যালোক যেমন পুরো দিনের কথা বলে দেয়, গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা খোকাও ছোটোবেলায় জানান দিয়েছিলেন– তিনিই হবেন বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপোশহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদে নেমে পরতেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর মেধা, পরিশ্রম, সাহস, মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বের মাধ্যমে হয়ে উঠেন বাংলার নয়নের মণি ও স্বাধীনতা পিপাসু মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাঁর অবস্থান হয় মানুষের মনের মণিকোঠায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র উপর। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই প্রথম বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার করা হয়। আর এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২-এর ভাষা আন্দোলন', '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন', '৫৮-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন', '৬৬-এর ৬-দফা', '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান', ৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন।

এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। তিনি একই সাথে রাজনীতি ও কূটনীতি দুটোই করেছেন ; একদিকে বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপোশ করেননি, অন্যদিকে দেশের সাধারণ মানুষের যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেদিক বিবেচনায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। যার প্রমাণ আমরা পাই ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও তৎপরবর্তী সময়ে। ৭ই মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন, ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সেই নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এর প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসলেও বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পর্দার অন্তরালে গণহত্যার পরিকল্পনা করতে থাকে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় বেলুচিস্তানের কসাই খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে।

কিন্তু নায্য অধিকারের প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু দমে যাননি, আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিল বাঙালির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতা। মাত্র ১৮ মিনিটের এই মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শাণিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণ মুক্তির কাঙ্ক্ষিত পথ। তাই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির মুক্তির মহাকাব্য। অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু সেদিন শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ক্রমধারায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ ন'মাস বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁর ভাষণে মূলত মানুষের মনের কথাগুলো ফুটে উঠেছিল। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর World Documentary Heritage-এর মর্যাদা দিয়ে Memory of the World International Register-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাঙালি হিসেবে এটি আমাদের বড়ো অর্জন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।

২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবস– বাঙালি জাতির জন্য এক বেদনাবিধুর ও শোকাবহ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে কাপুরুষের দল সেদিন নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ

করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক। সেদিন অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারাদেশ। হায়েনার দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানাসহ (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চালায়। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ন'মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ত্রিশ লক্ষ মানুষ। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়।

২৬শে মার্চ-আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি, কোনো কিছুই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হলেন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু তাঁকে নিঃশেষ করেনি বরং বাঙালির চিত্তাকাশে আরো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। তিনি আজো বাংলার আকাশে নক্ষত্রের মতো দীপ্তমান। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও উন্নত - সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। ■

উপপ্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা

গল্প

কাজলী নদী

তৌহিদ-উল ইসলাম

হামিদ আমার বাল্যবন্ধু। বালুয়াকান্দি প্রাইমারি স্কুলে আমরা এক সাথে পড়তাম। শৈশবে সে বাবাকে হারায়। ওর পেছনে আছে আরো দুটো ভাই। সংসারে মা তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। সে সংসারেও অনেক অভাব। মা ধান কিনে এনে, সেই ধানের মুড়ি ও মোয়া তৈরি করে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করত। উপার্জনের পথ শুধু এইটুকু। এক প্রকার খেয়ে না-খেয়ে দিন চলে যেতো। স্কুলের নিকটেই ওদের বাড়ি। বাড়ি বলতে পূর্ব ও উত্তর দিকে ছোটো দুটো কুঁড়েঘর। অন্য দুদিকে গাছের পাতা দিয়ে বেড়া দেয়া ঘর দুটোর একটিতে রান্না হয় অন্যটিতে বাঁশের পাতানো টঙে ঘুমানোর ব্যবস্থা। রান্নাঘরটির দুদিকে পাটকাঠি দিয়ে বেড়া দেয়া থাকলেও অন্য দুদিক খোলা। বাড়ির পূর্ব পাশে বয়ে গেছে কাজলী নদী। রবীন্দ্রনাথের ছোটোনদী কবিতার সাথে আমাদের এ নদীটা একেবারে মিলে যায়।

হামিদের বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছি। শেষ বারের মতো গিয়েছি ক্লাস ফাইভে যখন পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে একদিন হামিদ কানে কানে বলল, কামাল! মা আজ তোকে মুড়ি খেতে ডেকেছে!

সেদিন আমাকে মুড়ির সাথে দুধ ও খেঁজুর গুড় খেতে দিয়েছিল। খুব মজা করে আমরা দুজন এক সাথে খেয়েছি। তারপর আর যাওয়া হয়নি। প্রাইমারি শেষ করে আমি চলে আসি শহরে। কয়েক বছর পরে একাত্তরের জানুয়ারি মাসে নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনালে হামিদের সাথে দেখা হয়। আমি তখন তোলারাম কলেজের আইএসসি ক্লাসের ছাত্র। হামিদ জানালো, সে নারায়ণগঞ্জের কুশরা গ্রামের এক বাড়িতে জায়গির থেকে হাজিগঞ্জের এক স্কুলে পড়ে। বাড়ির মালিকের দুটো গরু ও দুটো ছেলে সামলাতে হয়। দুই ছেলেকে দুটোকে পড়াতে হয় আর গরু দুটোর খাবার জোগাড় করে দিতে হয়। বিনিময়ে তিনবেলা নিজের খাবার জোটে। সেদিন হামিদ এটাও জানালো যে, আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশোনা তার দু'বছর পিছিয়ে গেছে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর হামিদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম, দেখা হয়নি। পরে জেনেছি এ সময়ে ও কুশরা গ্রামে থেকে মেট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারপর মধ্য জুলাইয়ে পাকি-সামরিকের অধীনে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। আমি তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে আসামের জাফলং মিলেটারি একাডেমিতে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। হামিদ আমার মুক্তিযুদ্ধে যাবার খবর শুনে আইয়ুব ও সফিউল্লার সাথে ট্রেনিং এর জন্য ভারতে চলে আসে। এফএফ সদস্য হিসেবে ভারতে ট্রেনিং নিয়ে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে গ্রুপ কমান্ডার ফজলুল হকের নেতৃত্বে এলাকায় ফিরে আসে। হামিদের সাথে সফিউল্লাহ ও আইয়ুবও ফিরে এসেছিল। ওরা বিভিন্ন স্থানে ছোটোখাটো গেরিলা অপারেশন চালিয়ে আসছে।

একদিন আমরা পাঁচজনের একটি গেরিলা দল ভাটেরচর বাজারের রাইস মিলের পাশে অবস্থিত পাকসেনাদের ক্যাম্পে হামলার পরিকল্পনা করি। হামিদ শুনে আমাদের সাথে যেতে চাইল। এর আগে সে আমাদের দলের সাথে কোথাও অপারেশনে যায়নি। জন্মগতভাবে ওর ডান পা টা একটু খাটো হওয়ায় মনে হয়েছিল ও আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে দৌড়াতে পাড়বে না। সে কারণে আমরা এ অপারেশনে ওকে নিতে চাইনি। ওর জেদের কারণে পরে আমরা রাজি হয়েছিলাম।

সেদিন ছিল রোববার এবং একাত্তরের একুশে নভেম্বর। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত এগারোটার দিকে সবার বালুয়াকান্দি খেলার মাঠে জড়ো হবার কথা। আমি তৈরি হচ্ছি। রাত বাজে দশটা। হঠাৎ একটা এসএমজির গুলির আওয়াজ এল উত্তরপাড় থেকে। শত্রুপক্ষের গুলির আওয়াজ। আমরা তখন বুঝতে পাড়তাম কোন আওয়াজটি আমাদের আর কোনটি শত্রুপক্ষের। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন চাইনিজ অস্ত্রাদি বেশি ব্যবহার করত, আর আমরা ভারতীয় ও রাশিয়ান অস্ত্রাদি বেশি ব্যবহার করতাম। ফলে সেগুলোর আওয়াজ আলাদা।

উত্তর পাড়ে হামিদ ও তার দল রয়েছে। সেখানে এক পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতে দশ সদস্যের একটি দলের কয়েকদিন ধরে প্রশিক্ষণ চলছে। কিন্তু এ সময়ে সেখানে শত্রুপক্ষের গুলির আওয়াজ আমাকে বিচলিত করে তোলে। আমি দ্রুত তৈরি হয়ে সেদিকেই হাঁটতে শুরু করি। পথে কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। তাহলে গুলির কী কারণ? ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেলাম উত্তর পাড়ে। পৌঁছে দেখি, প্রশিক্ষণ ঘরের মধ্যে হামিদ গুলিবিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছে।

আমরা কয়েকদিন আগে মতলব থানার গোয়ালমারিতে গেরিলা অপারেশন করে একটা চাইনিজ এসএমজি নিয়ে এসেছি। প্রশিক্ষণ কালে সেটা থেকেই গুলি বের হয়ে হামিদের পেটে লেগেছে। প্রশিক্ষণার্থীরা আহাজারি করছে। হামিদের পেট থেকে রক্ত ঝরছে। সে জ্ঞান হারায়নি, কথা বলতে পারছে। সে নিজের মুখেই বর্ণনা দিলো– আমি তাড়াহুড়া করছিলাম বালুয়াকান্দি যাবার জন্য। স্ব স্ব ম্যাগাজিনে বুলেট ঢুকিয়ে ম্যগাজিনসহ এসএমজি দুটো টেবিলে গুছিয়ে রাখি এবং ঘর থেকে বের হই। এরা সবাই বলল, তোমার কখন ফেরা হয় ঠিক নেই। তাই এসএমজি দুটোর অপারেশনাল পার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দিলে আমরাও ছুটি পাই। ওদের কথায় আমি আবার শুরু করি। S, SA & A সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম। S for single fire. SA for semi auto fire.A for auto fire.বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ করেই ফায়ারিং কন্ট্রোল নভটা ঝ চিহ্নিত স্থানে রেখে অজান্তে এসএমজিটা কক

করে ট্রিগারে চাপ দিতেই একটা গুলি বের হয়ে আসে। এ ভুল সম্পূর্ণ আমার।

প্রশিক্ষণের সময় সর্বদা ম্যাগাজিনের বুলেট খুলে রাখতে হয়, এ কথা হামিদ ভালো করেই জানে। কিন্তু হামিদ ভুলেই গিয়েছিল যে এসএমজির ম্যাগাজিনগুলোতে বুলেট ভর্তি। ফলে ভুলের মাশুল দিতে হলো তাকে।

হামিদ এ দুর্ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করছে না। কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। ক্রমে সে ফ্যাকাসে ও দুর্বল হতে লাগল। এর মধ্যে ডাক্তার আবদুস সাত্তারকে সাথে নিয়ে ঘরের ভেতরে এল সফিউল্লাহ ও আইয়ুব। খোকা ভাই পূর্ব থেকেই ছিল। ডাক্তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখলেন। বুলেট হামিদের তলপেটে ঢুকে পেছন দিয়ে বের হয়ে গিয়েছে। একই সাথে শরীরের কিছু অংশকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। জরুরিভিত্তিতে অপারেশন ছাড়া বাঁচানো সম্ভব নয়। এ অবস্থায় একজন ডাক্তারের করার কিছুই নেই। ফলে প্রাথমিক ব্যবস্থা দিয়ে তিনি বিদায় হলেন।

হাসপাতালগুলো তখন পাকিস্তানি আর্মিদের দখলে। তাছাড়া এ অবস্থায় হামিদকে নিয়ে বের হলে আমাদের সবাইকে বিপদে পড়তে হবে। আবার এসএমজির ফায়ারের শব্দটা সেনাক্যাম্পে পৌঁছে যাবার কারণে এখানেও ওদের আবির্ভাবের শঙ্কা রয়ে গেছে। ফলে হামিদের সুস্থ হবার আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা পরবর্তী করণীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। অন্যদিকে হামিদকে ওযু করিয়ে দিয়ে কলেমা ও দোয়া দরুদ পড়ানোর ব্যবস্থাও চলছে।

আমরা হামিদকে বেঁচে থাকার মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সাহস যোগানোর চেষ্টা করতে থাকি। সবাই মিলে স্থির করলাম, ওর মা ও ছোটো ভাইদের ডেকে এনে শেষবারের মতো দেখা করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু হামিদ শুনে তা সরাসরি নিষেধ করে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে সবার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, আমার মা শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ নন। তিনি হয়ত ধরে নেবেন তোমরা আমাকে মেরে ফেলেছ। পাগলের মতো চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে শুরু করবেন। এমনকি সেনাক্যাম্পে গিয়েও নালিশ করতে পারেন। তখন তোমরা বড়ো বিপদে পড়বে। আমি হামিদ চলে গেলেও স্বাধীনতা আনার জন্য তোমাদের বেঁচে থাকতে হবে। বরং কোনোদিন মা আমার খোঁজ করলে বলবে, যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে ভারতে চলে গেছে। যুদ্ধ শেষ না হলে ফিরবে না।

হামিদের এমন কথায় আমরা সবাই হু হু করে কেঁদে উঠি। সে কান্নায় আমরা লড়াই করার অনেক শক্তি ফিরে পাই। নতুন করে দেশপ্রেমের শিক্ষা অর্জিত হয়। তারপর এক সময়ে বাংলার মেঘলা আকাশের চাঁদ হয়ে হামিদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়।

আমাদের ভেঙে পড়লে তো চলবে না। প্রভাতের আগেই দাফন সম্পন্ন করতে হবে। কাফনের জন্য পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করা হলো। ওদিকে কাজলী নদীর পাড়ে বাঁশঝাড়ে কবর খোড়া হলো, যাতে কেউ টের না পায়। বিশেষ করে হামিদের মা ও গ্রামবাসী। জলিল মুন্সিকে ডেকে আনা হলো। কিন্তু তিনি কোনো মতেই মুক্তিযোদ্ধার জানাজা পড়াতে রাজি হলেন না। তিনি জানালেন, সেনাক্যাম্পে খবর গেলে তাকে নাকি মেরে ফেলা হবে। জলিল মুন্সি চলে গেলেন। আমরা তাকে অনুরোধ করলাম কথাটা গোপন রাখার জন্য। এদিকে রাতের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পাখপাখালিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শেয়ালগুলো অকারণেই হুক্কাহুয়া করে ডাকছে। আমরা নিজেরাই কাফন পরিয়ে দিয়ে এক প্রকার মাটি চাপা দিয়ে মোনাজাত করলাম। গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলাম কবরটা। যাতে সহজে কারো চোখে না পড়ে। শেষে কাজলী নদীর পানিতে হামিদের জামাকাপড় ভাসিয়ে দিয়ে আমরাও সেই পানিতে অন্ধকারের শেষ চিহ্নটুকু ধুয়ে ফেলে সবাই বাড়ি ফিরলাম।

দিন সাতেক পরে হামিদের শেখানো খবরটা ওর মায়ের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা সফিউল্লাহকে পাঠালাম। ছেলে আবার ভারতে চলে গেছে শুনে তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করেন। এ সময়ে সফিউল্লাহ হামিদের মাকে উলটো বক্তব্য শুনিয়ে দিয়েছিল। তা হলো, যদি ছেলের জন্য এভাবে কাঁদতে থাকেন আর ব্যাপারটা যদি সেনাক্যাম্পে পৌঁছে যায়–তখন আপনি এবং আপনার ছোটো দুই ছেলে কেউ বাঁচবেন না। সফিউল্লাহ ফিরে এসে জানালো এতে খুব কাজ হয়েছে।

মাঝেমধ্যে আমাদের গেরিলা আক্রমণ চলছে। পাকিস্তান বাহিনী তখন দিশেহারা। বিশেষ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ঘোষণায় যুদ্ধের ধারা পালটে যায়। একের পর এক সাফল্যের খবর আসতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা গজারিয়া থানা শত্রুমুক্ত করি। পরের দিন মেঘনা ফেরিঘাটের পূর্বপাড়ে অবস্থিত সেনাক্যাম্প দখল করি। এরপর তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। আমি অনেক সাহস করে সফিউল্লাহকে সাথে নিয়ে ডিসেম্বরের শেষে হামিদের মায়ের কাছে গেলাম। সে দিনও সত্য বলা হলো না। গল্প বানিয়ে বলল সফিউল্লাহ। আর আমি চুপ থেকে সফিউল্লার মিথ্যা গল্পের সাক্ষী হয়ে গেলাম।

তারপর নতুন বছর এলো। বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন স্বাধীন দেশে। বাংলার প্রকৃতির বুকে হাসি ফুটল। নদীগুলো গতি ফিরে পেয়ে পূর্বের ন্যায় বইতে লাগল। থানা কমাণ্ডার নজরুল ইসলামের সাথে আমরা

কয়েকজন অস্ত্রের তালিকা তৈরি করছি। একত্রিশ তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু অস্ত্র জমা নেবেন। সময় হাতে দুদিন মাত্র। হঠাৎ সকালবেলা ঝড়ো হাওয়ার মতো খবর এলো, কাজলী নদীর ভাঙনে একটা লাশ বের হয়েছে। সর্বনাশ! সে কি! হামিদের লাশ নয় তো? কিছুক্ষণের মধ্যে সফিউল্লাহ চলে এল। বলল, যা হবার তা হয়ে গেছে। এই কাজলী নদী শেষ পর্যন্ত আমাদের বেইজ্জত করে ছাড়ল। শুনলাম, লাশে পচন ধরেনি। মাংসগুলো হাড়ের মধ্যে বসে গেছে। লাশের একটা পা খাটো। সবাই চিনে গেছে ওটা হামিদ।

আমি বললাম, হামিদ তো বটেই! কিন্তু ওর মায়ের প্রতিক্রিয়া কী? বলবে না তো আমরা খুন করে মাটি চাপা দিয়েছি।

–তা বলা মুশকিল! তবে আমাদের সবাইকে যাওয়া উচিত এবং প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা দরকার।

–তাই করো! সবাইকে খবর দাও! আর হ্যাঁ জলিল মুন্সিকে হাজির করতে হবে। তুমি আইয়ুবকে মুন্সির কাছে পাঠাও।

সফিউল্লাহ যেতে যেতে বলল, নদীকে বিশ্বাস করতে নেই কামাল! দেখলে তো এইটুকু নদী অথচ আজ কীভাবে আমাদের ডুবালো।

স্বাধীন বাংলাদেশে বহুদূর পর্যন্ত খবরটা পৌঁছালো। অনেক লোক জুটল। মাইকে থানা কমাণ্ডারের নাম ঘোষণা করা হলো। তিনি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদের শহিদ হবার প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। হামিদের দেশপ্রেমের কথা শুনে অনেকে কেঁদে ফেলল। জলিল মুন্সি তার ভুল স্বীকার করে সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন। হামিদের বাড়ির উঠোন ঘেঁষে কবর খোড়া হলো। সুগন্ধি ছিটিয়ে নতুন কাফন পরানো হলো। জলিল মুন্সিকে দিয়ে জানাজা নামাজ পড়ানোর ব্যাপারে একটু বিতর্ক দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত তিনিই জানাজা পড়ালেন। স্বাধীন দেশের শহিদ মুক্তিযোদ্ধার প্রথম জানাজার নামাজ।

থানা কমান্ডারের সাথে আমরা যখন হামিদের মায়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম, তখন দেখলাম তার চোখে পানি নেই। তিনি যেন তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন। তার চোখেমুখে স্বাধীনতার হাসি। আর কোল জুড়ে বয়ে যাচ্ছে শান্ত কাজলী নদী। ■

শিক্ষক, শিশুসাহিত্যিক ও গীতিকার

ইরিনা হক, দশম শ্রেণি, ইএসএস স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও জাতীয় শিশু দিবস

জায়েদুল আলম

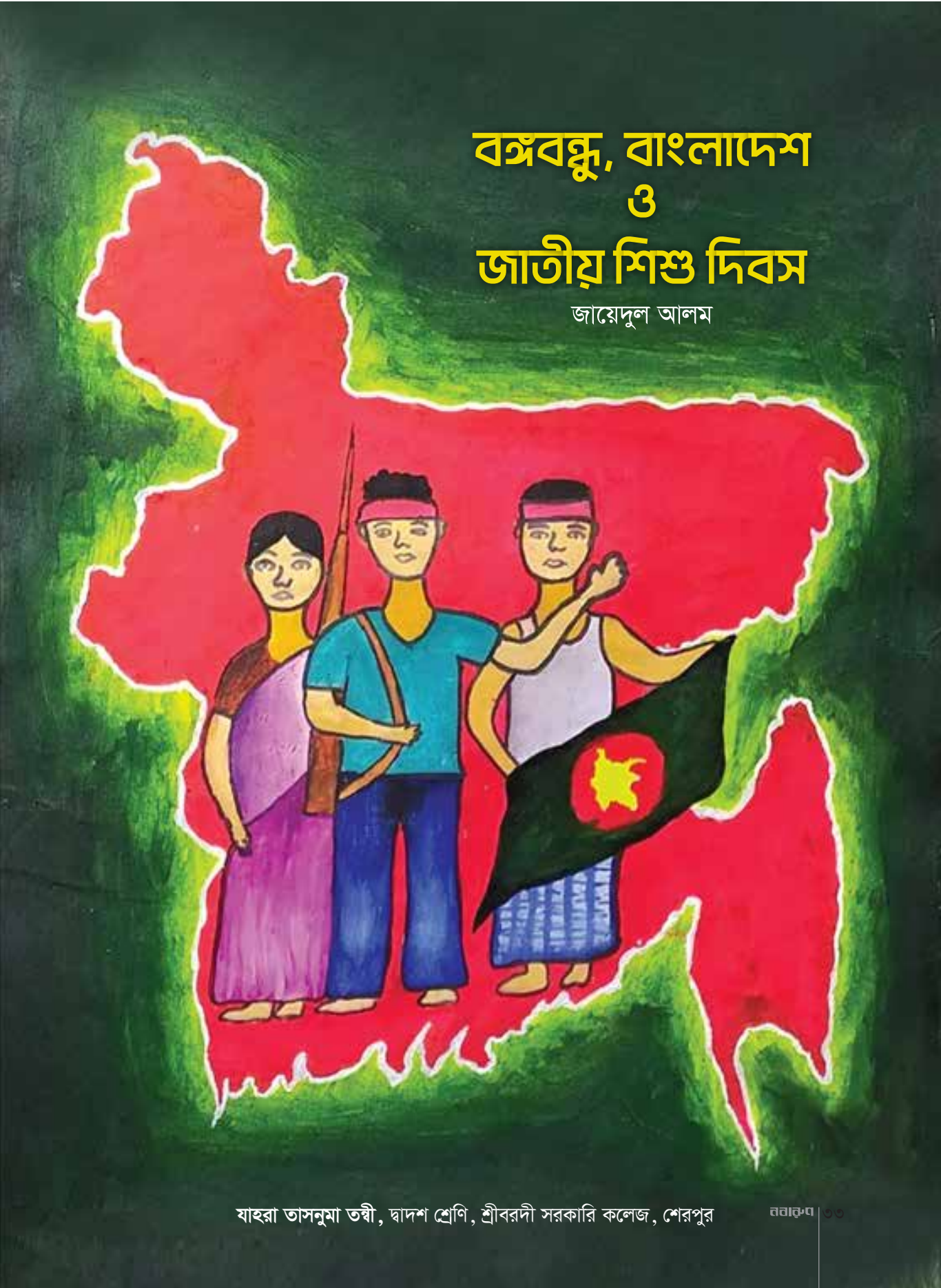

যাহরা তাসনুমা তন্বী, দ্বাদশ শ্রেণি, শ্রীবরদী সরকারি কলেজ, শেরপুর

শিশু প্রিয় বঙ্গবন্ধুর
যেদিন শুভ জন্মদিন
সেদিন হলো শিশু দিবস
সতেরো মার্চ দিনটি

বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল থেকে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাতীয় শিশু দিবসটি পালন শুরু হয়। এ দিনটিকে সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন আমাদের আনন্দের দিন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান, তিনি গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন) ছিলেন এবং মা'র নাম সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

শেখ মুজিবকে তাঁর বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়। শ্যামল পরিবেশে শেখ মুজিবের জীবন কাটে দুরন্তপনা করে। মধুমতির ঘোলাজলে গ্রামের ছেলেদের সাথে সাঁতার কাটা, দল বেঁধে হা-ডু-ডু, ফুটবল, ভলিবল খেলায় তিনি ছিলেন দুরন্ত বালকদের নেতা। তখন কে জানত এই বালকদের নেতাই একদিন বিশ্বনেতা, বাঙালি জাতির পিতা হবেন।

১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এখানে বছর দেড়েক যেতে না যেতেই খোকা আক্রান্ত হন বেরিবেরি রোগে। এ রোগ থেকেই তাঁর চোখে জটিল অসুখ দেখা দেয়। যার নাম গ্লুকোমা। বাবা লুৎফর রহমান অস্থির হয়ে পড়েন। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে খোকাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যান। সেখানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. টি আহমেদ তাঁর চোখের সার্জারি করেন। গ্লুকোমা থেকে সুস্থ হলেও চিকিৎসক তাঁকে চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এই কারণে ১৯৩৪ সাল থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন।

বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, পাখির সুমধুর সুর এসব বঙ্গবন্ধুকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, এই প্রাণীদের তিনি যা বলতেন তাই করত।

ভাত, মাছের ঝোল আর সবজি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার। এই মহান নেতা শৈশবে রোগা হলে কী হবে, খেলাধুলার ব্যাপারে তাঁর ছিল দারুণ আগ্রহ। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। আর মজাটা হতো ফুটবল খেলতে গেলেই। এমনিতেই তো তিনি ছিলেন ভীষণ রোগা, তাই যখন তিনি বলে জোরে কিক করতেন, নিজেও উলটে গড়িয়ে পড়তেন।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলাম না। তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভালো অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।

একবার তাঁর গ্রামের চাষিদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষকদের অনেক বাড়িতেই দুবেলা ভাত রান্না বন্ধ হয়ে যায় । সারা গ্রামেই প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ে চাপা গুঞ্জন। কিশোর মুজিব এ রকম পরিস্থিতিতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত। একটা কিছু করার জন্য তিনি ছটফট করছিলেন। পরে নিজের পিতাকে তিনি তাদের গোলা থেকে বিপন্ন কৃষকদের মধ্যে ধান বিতরণের জন্য অনুরোধ জানালেন। তাদের নিজেদের ধানের মজুদ কেমন, এই অনুরোধ তাঁর বাবা রাখতে পারবেন কিনা, সেসব তিনি ভাবেননি। কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটিই ছিল তখন তাঁর কাছে মুখ্য।

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে ”

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যখন গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনিস্টিউট মিশন স্কুল পরিদর্শনে আসেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিব যখন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কাছে নানা দাবি তুলে ধরেছিলেন। শেখ মুজিবের সৎসাহস, কর্তব্যবোধ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরে ডাকবাংলোতে ফিরেই তিনি শেখ মুজিবকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং কলকাতায় দেখা করতে বললেন। পরবর্তীতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন শেখ মুজিব।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হলে শেখ মুজিবুর রহমান দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। মুজিব কর্তৃক ছয় দফা কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পর আইয়ুব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেখ মুজিব এবং আরো চৌত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। সরকারিভাবে এ মামলাটির নাম দেয়া হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। মামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার এবং কর্মচারী। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন উর্দ্ধতন বাঙালি বেসামরিক কর্মকর্তা। শেখ মুজিব ইতোমধ্যে কারারুদ্ধ থাকায় তাঁকে এক নম্বর আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়। এ মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি অন্যান্য আসামির যোগসাজশে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় মুজিবের জনমোহিনী রূপ আরো বিকশিত হয় এবং সমগ্র জাতি তাদের নেতার বিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের দ্বারা সংগঠিত গণআন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, আইয়ুর সরকার দেশে আসন্ন একটি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টায় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন।

শেখ মুজিবের মুক্তির পরবর্তী দিন সর্বদলীয় ছাত্র

সংগ্রাম পরিষদ রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দীর উদ্যান) শেখ মুজিবের সম্মানে গণসংবর্ধনা আয়োজন করে। এ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানে সরকারকে বাধ্য করার ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকর রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তি বলে প্রমাণিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমদ ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের বঙ্গবন্ধু । তার কয়েকমাস পরে ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন– বাংলাদেশ ।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে (নারীদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসন সহ) জয় লাভ করে। আপামর জনগণ তাঁকে ছয় দফা মতবাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট প্রদান করে। ছয় দফা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রমনা রেসকোর্সে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং শপথ নেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তারা কখনও ছয় দফা থেকে বিচ্যুত হবেন না।

এ পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে না দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ এক ঘোষণায় ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। এ ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের বিশাল জমায়েতে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ আনেন।

ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেন– *'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'*

এ পটভূমিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক এবং নিরীহ লোকদের গণহারে হত্যা করে। এভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস গণহত্যা চালিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে ২৫শে মার্চ রাতে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা সম্প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান। তাঁর ঘোষণাটি নিম্নরূপ–

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহবান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

২৫শে মার্চ পাকবাহিনীর হামলার পর থেকে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়, সে সময় বঙ্গবন্ধু যদিও পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন তথাপি তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার নামে অভিহিত অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিরা ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল এ সরকার গঠন করে। তাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কও করা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের গোটা অধ্যায়ে শেখ মুজিবের অনন্য সাধারণ ভাবমূর্তি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং জাতীয় ঐক্য ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

পাকিস্তানি জান্তা বঙ্গবন্ধুর বিচার করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাঁর জীবন বাঁচাতে উদ্যোগী হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদারী থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি লন্ডন হয়ে বিজয়ীর বেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে প্রথম সরকারের মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শূণ্য থেকে শুরু করে তাঁর সরকারকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের অগণিত সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ভোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার বিশ্বাস ঘাতকের হাতে শহিদ হন। ১৫ই আগস্ট জাতির জীবনে একটি কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর সারাদেশে ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত আদর করতেন, ভালোবাসতেন। শিশুদের সাথে গল্প করতেন, খেলা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। আজকের তরুণ প্রজন্ম এই মহান নেতার আদর্শ থেকেই দেশ গড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তাদের মাঝেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন। বিবিসি বাংলার জরিপে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন।

সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায়–'যেখানে ঘুমিয়ে আছো, শুয়ে থাকো, বাঙালির মহান জনক তোমার সৌরভ দাও, দাও শুধু প্রিয়কণ্ঠ শৌর্য আর অমিত সাহস টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে আমাদের গ্রামগুলো তোমার সাহস নেবে নেবে ফের বিপ্লবের দুরন্ত প্রেরণা'।

আজকের শিশুরাই আমাদের আগামীর ভবিষ্যৎ। এজন্য শিশুদের যথাযথ শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে তাদেরকে সেভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে বাস ১৬ কোটি মানুষের। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৬ কোটিরও বেশি শিশু। তাই শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে। কাব্যিক ভাষায়:

শিশুদের মুখে নয় হৃদয়ে রাখো যদি
এই ভালোবাসা হবে সার্থক,
শিশুরা ভালো হলে দেশ হবে উন্নত
উজ্জ্বল হয়ে রবে মারাত্মক।
শিশুদের সাদামনে কালো দাগ লাগলে
আমরাই হবো তাতে দোষী যে
নৈতিক শিক্ষায় থাকলে দীক্ষায়
জ্ঞানে ও গুণে হবে খুশি সে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন অসামান্য গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর মাঝে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।■

কথাসাহিত্যিক

স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক

কে সি বি তপু

বঙ্গবন্ধুর হৃদয় নিংড়ানো ৭ই মার্চের অলিখিত ভাষণের শেষাংশে তাঁর বক্তব্যের স্লোগান ধ্বনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে এক পতাকাতলে সমবেত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসাধারণ সম্মোহনী, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সুদূরপ্রসারি চিন্তা, গভীর প্রজ্ঞা ও পরম আন্তরিকতায় স্বাধীনতাকামী উত্তুঙ্গবাঙালি জাতিকে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃপ্ত ডাক সত্ত্বেও আলোচনার দরজা খোলা রেখে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ব্যতিক্রমী ও অনন্য। এ ভাষণের আহ্বান যে-কোনো ব্যক্তিকে যে-কোনো কালে বিমুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করবে।

মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণীত ইশতাহারে জনগণের ম্যান্ডেটে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শুরু করে গভীর ষড়যন্ত্র। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিদের অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লাখো লাখো জনতার উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণে রচনা করেন বাঙালির মুক্তি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের একান্ত ও নিজস্ব উচ্চারণ 'ভাইয়েরা আমার' বলে বক্তৃতা শুরু করেন। লাখো লাখো জনতার সামনে একেবারে আড়ম্বরহীন এমন অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ শুধু বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই ছিল সম্ভব। ভাষণের শুরুতেই বাঙালির আবেগকে উসকে দিয়ে

অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন–

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমার পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্যে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরীব, দুঃখী আর্তমানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।...

এ ভাষণে বারবার বলেন 'আমার লোক'–যা জনসাধারণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর উদার ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের প্রতিটি ধ্বনি বাঙালির শিরায় শিরায় আবেগ আর উত্তেজনার ঢেউ খেলে।

এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার চূড়ান্ত আহ্বানটি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখাও দিয়েছিলেন। এ ভাষণে উচ্চকিত 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে', 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে', 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ'–ইত্যাদি তাঁর মর্মস্পর্শী তেজস্বী আহ্বান নিরস্ত্র বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

লাখো লাখো জনতার সামনে পাকিস্তানি হানাদারদের কামান-বন্দুক-মেশিনগানের হুমকির মুখে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। বঙ্গবন্ধু সুকৌশলে বক্তৃতার মাঝখানে চারটি শর্ত আরোপ করলেন। মার্শাল ল' প্রত্যাহার, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরত নেওয়া, নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা। এ চারটি শর্ত দিয়ে একদিকে অলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখলেন, অপরদিকে প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়ে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশনা দিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তাঁর অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর এ ভাষণে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেথে বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা শেষ করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এবং 'জয় বাংলা' বহুল কাঙ্ক্ষিত ধ্বনি উচ্চারণে। ঐতিহাসিক ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কবি নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় সেই কাঙ্ক্ষিত দৃশ্যপট বাঙ্ময়–

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সমগ্র বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। শ্রেষ্ঠ ভাষণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য– নেতৃত্বের সর্বোচ্চ দেশাত্মবোধ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির এবং লক্ষ্য অর্জনে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। অপর একটি বৈশিষ্ট্য– সময়ের পরিসীমায় গণ্ডিবদ্ধ না থেকে তা হয় কালোত্তীর্ণ ও প্রেরণাদায়ী। এ ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর কাব্যিক গুণ-শব্দশৈলী ও বাক্যবিন্যাস, যা হয়ে ওঠে গীতিময় ও অনুরণিত। এ ভাষণের অপর একটি

বৈশিষ্ট্য হলো সংক্ষিপ্ত। এ ভাষণের প্রতিটি শব্দ নির্বাচন করা হয়েছিল অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং প্রয়োজনের নিরিখে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও কৌশলী। পৃথিবীর বহু সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। এ ভাষণ বিশ্বসম্প্রদায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল। লন্ডন থেকে প্রকাশিত Sunday Times-এ ভাষণের জন্য বঙ্গবন্ধুকে A poet of politics আখ্যায়িত করেন। কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন, '৭ই মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল।' গ্রেট ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথ বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চিরজাগরূক থাকবে। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।'

সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির মহান কবি। তাঁর ভাষণ শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, কাব্যিক-ব্যঞ্জনাময়ও। নিরঙ্কুশ বিজয়ী দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শর্তাধীনে সুকৌশলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কেউ ঐতিহাসিক ভাষণে এভাবে স্বাধীনতার ডাক দিতে পারেননি। তিনি এমনভাবে মুক্তিসংগ্রামের ডাক দিলেন যাতে কেউ তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তির চিরন্তন উৎস, যা বাঙালি জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বীর বাঙালিতে পরিণত করে। বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকের এ ঐতিহাসিক ভাষণ মুক্তির কালজয়ী এক মহাকাব্য। এ ভাষণ শুধু বাঙালি জাতির জন্যই নয়, বিশ্বমানবতার জন্যও অবিস্মরণীয় এবং অনুকরণীয় এক মহামূল্যবান দলিল। ■

সাংবাদিক, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

এই বাংলাদেশ

হিমাদ্রি হাবীব

এই বাংলাদেশ
উচ্ছ্বাসে উত্তাল,
এই বুকটা সবুজ বই
বর্ণমালা লাল।

এই বুকটা ডিসেম্বর
স্বর্গ-সুধাময়,
এই বুকটা গৌরবের
সুখগুলো অক্ষয়।

অদম্য এক শহিদমিনার
আমার কচি বুক,
এই বুকটা হাজার বুকের
স্বপ্নে জাগরূক।

এই বুকটা আনন্দের
কান্নাভেজা গান,
এই বুকটা গর্জে ওঠা
রেসকোর্স ময়দান।

বুকের ভেতর রং-পেন্সিল
ছবির খাতায় মুখ,
বাংলা মায়ের শাড়ির আঁচল
অক্ষত থাকুক।

স্বাধীনতার যুদ্ধ

মাহমুদুল হাসান খোকন

অনেকদিন আগের কথা। সময়টা ঠিক ১৯৭১ সালের। কাশিমপুর গ্রামে বাস করে বরকত আলী। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। একটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। যদিও তখন বেতন ছিল সামান্যই। তাতেই মাস চলে যেত। দ্রব্যসামগ্রীর দাম ছিল খুবই কম। যে টাকা বেতন পেতো তাতেই জীবন ভালোভাবে চলত। বরকত আলীর জায়গা জমি নেই বললেই চলে। তবে মাস্টার হিসেবে এলাকায় যথেষ্ট সম্মান আছে। চাকরির মাসিক সম্মানী জমা করে রেখেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে যেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন চালানো যায়। সংসার জীবনে সন্তানের মুখ দেখবার মতো কোনো সৌভাগ্য কপালে জুটেনি তার। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল হয়নি। তাই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে সব। কেননা বরকত আলী জানে যে, আল্লাহ যাকে খুশি সন্তান দেন, যাকে খুশি দেন না। আবার কাউকে শুধু ছেলে দেন আবার কাউকে মেয়ে দেন। আবার কাউকে ছেলেমেয়ে উভয়জনকে দিয়ে থাকেন। নিজের কপালকে মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করে থাকেন। তাই আশেপাশে বা

প্রতিবেশি ছেলে-মেয়েদেরকে খুব ভালোবাসত এবং আদর করত। নিজের একাকিত্ব দূর করার জন্য পাড়াপড়শি সকলের বাড়িতে যেত। সমবয়সিদের সাথে নানান বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করত। এভাবেই বরকত আলী তার দিনগুলি অতিবাহিত করতে লাগল।

দুই

গ্রামের দক্ষিণে প্রতি সোমবার আর বৃহস্পতিবার করে বাজার বসত। সেদিন ছিল সোমবার। যথারীতি বাজার করে চা পান খায় এবং আড্ডা দেয়। ফেরার পথে সে হাট থেকে তার নিজের জন্য একটা নতুন লুঙ্গি কিনে সন্ধ্যার বেশ আগেই বাসায় ফিরে আসে। বাসায় আসার পর দেখে লুঙ্গির ভিতরে একটি খবরের কাগজের দুটি পাতা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পাতাটিই। দেখে মনে হলো অনেক পুরানো। তবু তারিখ দেখে জেনে নিলো ২৯শে মার্চ ১৯৭১ সাল। বেশ কয়েকদিন আগের। পত্রিকায় লাল কালিতে মোটা অক্ষরে লেখা শিরোনাম 'স্বাধীনতার ভয়াবহ যুদ্ধ'। কৌতূহলের সাথে মনোযোগ দিয়ে পুরো লেখাটা পড়ে নিলো।

আজকের তারিখ স্মরণ করল। আজ জুলাইয়ের ২৬ তারিখ। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ২৫শে মার্চ কালোরাত থেকে। দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। অথচ আমরা জানি না। যার যা আছে তাই নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে দেশকে রক্ষা করতে। ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে পাকসেনারা। বিষয়টি স্ত্রীকে জানালো। স্ত্রী ভয় পেয়ে বলল, এদিকে যদি এসে পড়ে তাহলে তো রক্ষা নেই। বরকত আলী তার স্ত্রীকে সাহস জুগিয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই। আমাদেরও কিছু একটা করতে হবে। প্রয়োজনে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী গঠন করব। শোনো আমি আসছি। বলে বরকত আলী খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে চারমাথার দিকে রওনা দিলো। তড়িঘড়ি করে বিশ মিনিটের রাস্তা বারো মিনিটের মধ্যে চারমাথায় পৌঁছুলো। এলাকাটি ছোটো হওয়ায় চারমাথায় একটিমাত্র চায়ের দোকান। পৌঁছেই সে চায়ের দোকানে বসে পড়ল। হাতে পেপার তা অনেকেই লক্ষ করল। বসে একে একে উপস্থিত সকলকে ডাকল। সেখানে ছিল নয়জন– একেকটি বাড়ির অভিভাবক, সাথে আছে তিনজন কলেজপড়ুয়া যুবক ছাত্র। স্কুল পড়ুয়া একজন কিশোর। সব মিলিয়ে তের জন। মাস্টারের ডাক শুনে সবাই কাছে এল। তারপর বরকত আলী তার হাতে পুরানো পেপারের মূল খবরটি পড়ে শোনালো এবং বলল, দেশকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকেও প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। কখন এসে পড়বে বলা যায় না? তাই শোনো, এখন সন্ধ্যা বেলা। কারো কিছু কেনাকাটার থাকলে কিনে নিয়ে যে যার মতো বাড়ি চলে যাও। আর আগামীকাল সবাই ফজর সালাতের পর আমার বাসায় চলে আসবে। পরামর্শ করতে হবে যে, আমরা এরকম পরিস্থিতিতে কী করব? বলে বরকত আলী নিজেও তার বাড়ি চলে এল।

কথামতো পরদিন সকলেই ফজরের পর বরকত আলীর বাড়িতে হাজির হলো। মাস্টার সাহেব সকলের মনে সাহস জোগাতে অনুপ্রেরণার সাথে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে দিক-নির্দেশনামূলক সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করল। আর নিরব দর্শকের ভূমিকায় সবাই বরকত আলী সাহেবের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করে।

তিন

যে যার বাড়িতে মাটির নিচে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের গর্ত খুঁড়ে নিলো। যাতে অবস্থা বেগতিক দেখে লুকাতে পারে। কিন্তু বরকত আলী তা করল না। দেশকে বাঁচাতে গিয়ে শহিদি মর্যাদা লাভ করব তবু ভীরুর ন্যায় পালাবো বা লুকাবো না।

বেশ কয়েকদিন পর তার পাশের উপজেলা থেকে হঠাৎ তার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে (সম্পর্কে ভাতিজা) গভীর রাতে বরকত আলীর বাসায় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়ে ডাকতে শুরু করল।

জেঠো জেঠো! বড়ো মা ও বড়ো মা! ডাক শুনে বরকত আলীর ঘুম ভেঙে গেল। ভিতর থেকে বরকত আলী বললেন, কে?

আমি সুলতান জেঠো।
উঠেন একটু। তড়িঘড়ি করে উঠে দরজা খুলে দিলেন। কী ব্যাপার এত রাতে?
তার চেহারা দেখে বরকত আলী জিজ্ঞেস করল, বাসায় কিছু হয়েছে?

ছেলেটি উত্তরে বলল, জি! পাকসেনারা রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি এসে মানুষদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে। সাথে সহযোগিতা করছে এলাকার রজব চাচা আর কুরবান দাদা। তারা চাচা-ভাতিজা। গত রাত এগারোটার দিকে ঘুমোতে যাবার জন্য আমি আমার ঘরে শুয়েছি। বাবাও হয়ত শুয়েছে। বাড়ির ভিতরে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। হঠাৎ জুতার খটখট শব্দ শুনতে পেলাম। কয়েকজনের জুতার শব্দ। বাবাকে রজব চাচা ডাকছে। কুরবান দাদাও ডাকছে। আমি জানি এরা তো জুতা ব্যবহার করে না তাহলে জুতার শব্দ! বিষয়টি আমার সন্দেহ লাগল তাই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম যে, বেশ লম্বা লম্বা চার-পাঁচজন লোকও সাথে। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হলো এরাই হচ্ছে পাকবাহিনী। তারা কেউ কোনো কথা বলছে না। তাদের মধ্যে তিনজনের হাতে আর দুজনের পিঠে বড়ো বড়ো বন্দুক। বাবাও বুঝতে পারেনি কী হতে যাচ্ছে তাই বাবা দরজা খুলে বের হওয়ামাত্র কিছু বুঝে উঠার আগেই হাতে বন্দুকওয়ালা তিনজনই বাবার বুকে গুলি করল। আমি নির্বাক হয়ে দেখছিলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। এটা কী হলো? চুপ করে শুধু দেখলাম। চিৎকার দেবার চেষ্টা করেও যেন পারলাম না। বেরও হবার সাহস পেলাম না ভয়ে। বসে পড়লাম বিছানায়। কানে ভেসে আসলো রজব চাচাকে কুরবান দাদা বলছে তাড়াতাড়ি গরু দুটি বের করে আনো। শুনে আমি হতবাক। চিৎকার করার শক্তি ও সাহস দুটোই হারিয়ে ফেলেছি।

অত্যন্ত কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলছে, তারা বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। চোখের সামনে বাবাকে মরতে দেখলাম। কী ভয়ানক অবস্থা? কী করব বুঝতে না পেরে কোনোমতে পালিয়ে এলাম।

বরকত আলী আশ্চর্য হয়ে গেলেন ছেলেটির কথা শুনে। সেই ছেলেটি বলল, জায়গা জমিও নেই যে থেকে যাব। সর্বশেষ সম্বল দুটি গরু তাও দালালরা নিয়ে গেল। উপায় না পেয়ে সব ছেড়ে এখানে চলে এলাম।

বরকত আলী বলল, ঘরে এসো বাবা। ভাত খাও? না জেঠো। কিছু খাব না। নিজেই গ্লাস নিয়ে পানি খেয়ে নিলো। আর বলল, জেঠো আমার ভীষণ ভয় করছে। সাহস দিয়ে বলল, এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঘুমাও এখন অনেক রাত হয়েছে।

পরদিন ফজর সালাত শেষে আবারো সকলকে বসার জন্য বলা হলো। কথামতো সকলে বরকত আলীর বাসার উঠোনে সমবেত হলো। তার ভাতিজার ঘটনাটি সকলকে জানানো হলো। শুনে সবাই বিস্মিত। সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে বলা হলো। অনেকে অনেক কৌশল নিয়ে আলোচনা করল। যাতে করে পাকসেনাদেরকে পরাস্ত করা যায়। আমরা কোথাও যাব না কোনো প্রশিক্ষণ নিতে। আমাদের মতো করে যত প্রকার কৌশল আছে সেটাই আমরা প্রয়োগ করব। প্রশিক্ষণ করে এসেও তাদের হাতে মরা লাগতে পারে। আমরা নিজেদের কৌশলে তাদেরকে শেষ করতে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবো।

এমনি করে প্রায় প্রতিদিনই বৈঠক হয়। কয়েক মাস চলে গেল এ অবস্থায়। সে কাঙ্ক্ষিত দিনক্ষণ যেন ঘনিয়ে এল। অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো।

আজ ডিসেম্বরের তিন তারিখ। খবর পেল যে তাদের গ্রামে পাকসেনারা ঢুকে পড়েছে। রাত হলে তারা বেরিয়ে পড়ে। দিন হলে যে কোথায় থাকে জানা যায় না। তবে রাত হলে ঠিকই হামলা করে। বরকত আলী মাস্টার তার নিজের বুদ্ধিতে কিছু ফাঁদ পাতলো এবং এলাকার সকলকে সে ফাঁদ তৈরির শিক্ষা দিলো। মাস্টার সাহেব জানে শক্তি দিয়ে তাদের সাথে পারা যাবে না বরং কৌশলে এবং বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে মারতে হবে। শোনো আমরা আজ থেকে রাতে ঘুমাবো না। রাত হলে বাড়ির মহিলাদের একেকদিন

একেক বাড়িতে রাখব যাতে করে তারা নিরাপদে থাকে। আর আমরাও দলবদ্ধভাবে তাদের সুরক্ষার জন্য ঘরের বাইরে উৎপেতে বসে থাকব। সুযোগ পেলে তাদের উপর কঠিনভাবে আঘাত করব।

চার

কেউ আঁচ করতে পারেনি যে গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য কলিম শেখ খুব চতুরতার সাথে পাকবাহিনীর প্রধানকে এলাকার সব খবরাখবর দেয়। কলিম মেম্বার থাকা অবস্থায় খুব জ্বালাতন করত। ঠিকমতো মাল বিতরণ করত না। দিলেও অর্ধেক দিত। মেম্বার জানত যে পাকসেনারা মানুষ মেরে সারা দেশ দখল করবে। আর কিছু নেবে না। এ সুযোগে যদি জায়গাজমি-ঘরবাড়ি, গরু-ছাগল সব নিজের করে নিতে পারি তাহলে বাকি জীবন রাজার হালে কাটাতে পারব। আর পাক সরকারও আমাকে কিছু করবে না বরং আরো সুবিধা দিবে। এ ভাবনায় কলিম শেখ পাকসেনাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। পাকসেনারা কাশিমপুর গ্রামের পাশের গ্রামে তাঁবু স্থাপন করে তাদের হীন কার্যকলাপ চালায়। দিনে কেউ বের হয় না। গ্রামের লোকও চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে তাদের ভয়ে।

ডিসেম্বরের নয় তারিখে মাস্টারের পাশের বাড়ির এক ছেলে বয়স নয়-দশ বছর হবে। তার নানার বাড়ির খোঁজখবর নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দেখতে পেল কলিম মেম্বার পাকসেনাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সাথে কথা বলছে। দ্রুত এসে বিষয়টি বরকত আলী মাস্টারকে জানিয়ে দিলো। মাস্টার চিন্তায় পড়ে গেল। তাহলে তো আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। আবারো সবাইকে ডেকে বিষয়টি অবহিত করল। যেভাবে হোক মেম্বারকে কিছু একটা করতে হবে দেশের স্বার্থে। কথামতো মাস্টার অন্য আরেকটি ছেলেকে গুপ্তচর হিসেবে মেম্বারের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য লেলিয়ে দিলো। ছেলেটি খোঁজ নিয়ে দেখল যে, সত্যি কলিম শেখ পাকবাহিনীদের সাথে মিশে। বাসায় খোঁজ নিয়ে দেখল বাড়ির ভিতরে অনেকগুলো গরু-ছাগল। বাইরে থেকে তা দেখার বা জানার কোনো সুযোগ নেই কারোর। কেননা কেউ বের হয় না।

মেম্বার কলিম শেখ দিনের বেলা এলাকার খোঁজ নিত কেউ বুঝতে পারত না। রাতে হায়েনাদের সাথে মিশে লুটপাট করছে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো আগে মেম্বারকে একটা কিছু করতে হবে। কথামতো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো। এই শোনো, আমরা আগামী পরশু নয় তারিখ সন্ধ্যার পর তাকে ডেকে

আনি যাতে করে কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা ডেকেছি। কেননা এখন সন্ধ্যার পর কেউই বাহিরে বের হয় না। যদি আসে তাহলে তাকে আগে বুঝাবো যদি বুঝ মানে তবে তাকে দিয়ে পাকসেনাদের শেষ করা সহজ হবে। নচেৎ কোনো কমবেশি করলে তাকেই শেষ করে দিব। একজন ছোটো ছেলেকে বলা হলো যে, সবুজ তুমি আজ কলিম মেম্বারের সাথে দেখা করে বলবে আমার কথা। বরকত আলী মাস্টার দাদা আপনাকে আগামী পরশু অর্থাৎ নয় তারিখ সন্ধ্যার পর বিশেষ কী কারণে দেখা করতে বলেছে। আমার কথা বললে অবশ্যই আসবে। এদিকে মাস্টার সাহেব বেশ কয়েকজনকে বিষয়টি অবহিত করে রাখে যে মেম্বার আমাদের কথা বুঝে মানলে ভালো কিন্তু যদি বুঝতে না চায় তাহলে কোনো কথা নেই, গণধোলাই দিয়ে মেম্বারের খেল খতম করব। পরে তাদের।

নয় তারিখ এসে গেল। বাড়ির আশেপাশে সবাই উৎপেতে থাকল। যথারীতি মেম্বার কলিম শেখ সন্ধ্যার পরপরই বরকত আলী মাস্টারের বাসায় আসে। সালাম ও কুশল বিনিময় হবার পর বসে কথা বলার প্রস্তাব দিলো মাস্টার।

ঠিক আছে বলে বলল, মাস্টার ভাই, আমার একটু ব্যস্ততা আছে।

মাস্টার বিষয়টি আরো ক্লিয়ার হয়ে নিলো। দেশের বা এলাকার যে অবস্থা তাতে কীভাবে রাতে কাজ থাকতে পারে? কিছু বুঝতে না দিয়ে বলল, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি হবে। তবে আজ তোমাকে সত্য কথা বলতে হবে মেম্বার!

কী সত্য কথা মাস্টার ভাই? মেম্বার মাস্টারের বয়সে ছোটো হবে বিধায় মাস্টার তুমি করে বলে আর মেম্বার আপনি বলে সম্বোধন করে। শুনলাম তুমি নাকি পাকসেনাদের সাথে মিশো? একথা শুনে মেম্বার আশ্চর্য হলো! মনে মনে ভাবল মাস্টার সাব জানল কীভাবে? মেম্বার মাস্টার সাহেবকে মিথ্যা বলতে পারল না তাই বলল, হুম।

শুনো মেম্বার ওদের উপকার করে কোনো লাভ নেই। কেননা ওরা যে তোমার ক্ষতি করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা তোমার আছে? তা কিন্তু নেই। বরং নিজের দেশকে বাঁচাতে পারলে দেশপ্রেমের সওয়াব পাবে। দেশপ্রেমও ইমানের বহিঃপ্রকাশ। নিজের দেশের প্রতি আমাদের টান থাকবে না তো কি ওদের থাকবে? এমন আরো অনেক সুন্দর সুন্দর বুঝদার ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শমূলক কথা বুঝানোর পর মেম্বারের মনের ও মতের যেন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল খুব সহজে। বলল, কী করব এখন বলুন? আপনি আমার অন্তরচক্ষু খুলে দিয়েছেন। এতদিন লোভের মধ্যে ছিলাম। তো শুনেন ভাই, ওদের সাথে মিশে আমি প্রতিরাতে অতি কৌশলে যে কয়জন পারি ডেকে আনব যাতে দেশ রক্ষা করতে এদের শেষ করতে পারি। প্রতিরাতে কিন্তু দু-চারজন করে মারা পড়ছে কোথাও কোথাও। এখন আর মাত্র ১২ জন পাকসেনা রয়েছে।

কথামতো কলিম শেখ পরদিন পাঁচ-ছয়জনের একটি দল নিয়ে বেরুলো। এদিকে তো সন্ধ্যার পর কোনো মানুষের আনাগোনা শোনা যায় না। মনে হয় এলাকায় কোনো মানুষ নেই। বরকত আলী ১০-১২ জনের বাহিনী নিয়ে তার বাড়ি থেকে বেশ কয়বাড়ি পূর্বে ঝোপঝাড়ময় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বুটজুতোর শব্দ কানে ভেসে আসছে। অনেকে মনে মনে ভয়ও পাচ্ছে। কেননা তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। প্রত্যেকে নিজের বাড়ির প্রয়োজনীয় দা বটি মোটা মোটা বাশেঁর লাঠি হাতে নিয়ে সতর্কতার সাথে লুকিয়ে আছে। কয়েকদিন থেকে এভাবে লুকিয়ে থাকে তারা। বরকত আলী অনেক আগেই এ ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছে যে, মরতে তো হবেই তখন কিছু করতে অসুবিধা কী? তাই সুযোগ মতো মোটা মোটা লাঠিসোটা দিয়ে যদি দু-চারটা আঘাত একসাথে করা যায় তাহলে আর রক্ষা পাবে না। ঘায়েল করতে পারব আমরা। অসাধারণ এক মনোবল চাষাবাদ করছে মনের মাঝে সকলে। মাস্টারের কথায় প্রেরণা পেয়ে বেশ সাহস নিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ।

পাঁচ

ছয়জনকে সাথে নিয়ে কলিম মেম্বার আগে আগে আর ওরা পিছে পিছে হাঁটছে তাদের মিশন চালাতে। হঠাৎ ওদের একজনের পেটে মোচড় দিয়ে উঠল। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে বিষয়টি জানিয়ে বলল, তোমরা আগাও আমি কাজ সেরে আসি বলে এক পাকসেনা ডানদিকে ঝোপঝাড়ে গেল। বরকত আলীর সহযোদ্ধা লুকানো বাহিনীর কাছাকাছি কেবলই বসছে। এ সুযোগ কোনোভাবে হাতছাড়া করা যাবে না। তাই ভালো করে লক্ষ্য নিয়ে মাথার দিকে আঘাত করলে পাকসেনা লুটিয়ে পড়ে মারা গেল। এ মিশন সফল হলো। এবার অপেক্ষা সে বাহিনীর ফেরা পর্যন্ত। তারাও অনেক দূর গিয়ে তাদের আসল উদ্দেশ্য ছেড়ে পিছনে ফেলে আসা সৈন্যের কথা আলোচনা করে খোঁজার জন্য ফেরত আসছে। এরা অর্থাৎ বরকত আলীরা ইতোমধ্যে সে জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় ঠিক সেভাবে উৎপেতে বসে আছে। এবার সবাই একযোগে তাদের উপর হামলা করবে। সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি ঘনিয়ে আসলো। কথাবার্তা তেমন বলছে না। শুধু জুতার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কলিম মেম্বার তাদের আগে আগে হাঁটছে। আর ওরা পিছনে। কাছে চলে আসা মাত্রই অতর্কিতভাবে লাঠিসোটা দিয়ে প্রত্যেকের উপর আঘাতের পর আঘাত করে। তারা তাদের বন্দুক ব্যবহার করার কোনো সুযোগ পায়নি। ফলে তারা মারা গেল। একটু পরে সে রাতেই শোনা গেল অন্যদিকের পাকসেনারাও নিহত হয়েছে। ১০ই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হলো কাশিমপুর গ্রাম। দেশের মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় স্থান পেল সকলের নাম। সফল হলো নিরস্ত্র বাহিনীর কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ।■

গল্পকার

উপমা দত্ত তরী, তৃতীয় শ্রেণি, বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

মনিরুল ইসলাম

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের সময় পদ্মা নদীর পাকশী-ভেড়ামারার সংযোগ সৃষ্টির জন্য নির্মাণ করা হয় ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজ । এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলসেতু। এর উপর দুটি ব্রড গেজ রেলাইন রয়েছে ১০০ বছর মেয়াদকালের এ ব্রিজটি ১৯১৫ সালের ৪ঠা মার্চ পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশীতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হয়। আজো ব্রিজটি দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনও চলছে নিয়মিত।

১৯০৯ সালের প্রথমভাগে প্রাথমিক জরিপ, জমি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পাথর সংগ্রহের কাজ শুরুর মধ্য দিয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নির্মাণকাজ শুরু হয়।

ব্রিজটির ১৫টি স্প্যানের দুটি বিয়ারিংয়ের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য ৩৪৫ ফুট দেড় ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৫২ ফুট। প্রতিটি স্প্যানের ওজন ১২৫০ টন, যা রেললাইনসহ ১৩০০ টন। সেতুটিতে মোট ১৫টি স্প্যান ছাড়াও দুই পাড়ে তিনটি করে অতিরিক্ত ল্যান্ড স্প্যান রয়েছে। দুটি বিয়ারিংয়ের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য ৭৫ ফুট। এভাবে ব্রিজটির মোট দৈর্ঘ্য ৫৮৯৪ ফুট বা এক মাইলের কিছু বেশি। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ২৪ হাজার ৪০০ শ্রমিক কাজ করে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে ব্রিজের কাজ শেষ করেন।

ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিজটি উদ্‌বোধন করেন। এরপর ব্রিজের ওপর দিয়ে ও ট্রেন চলাচলের জন্য তা উন্মুক্ত করা হয়। তার নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। উদ্‌বোধনকালে সেতু প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী স্যার রবার্ট উইলিয়াম গেইলস্ আবেগভরে বলেছিলেন, এ সেতু চির যৌবনা হয়ে থাকবে। সত্যিই তাই! ২০২৩ সালের ৪ঠা মার্চ ১০৮ বছর পার করার পরও ব্রিজটির গায়ে বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা বাহিনীকে রুখতে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ বিমান থেকে বোমা ফেলা হয় পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর। বোমার আঘাতে সেদিন সেতুর ১২ নম্বর গার্ডার ভেঙে যায়। আরও বেশকিছু গার্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ভারত সরকার ১২ নম্বর গার্ডারের অনুরূপ আরেকটি স্প্যান স্থাপন করে দেয়। তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে রেলযোগাযোগ পুনঃস্থাপন কর্মসূচির উদবোধন করেন। সে সময়ে এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, এ ব্রিজের পুনর্নির্মাণ জাতীয় পুনর্গঠন কাজে আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করুক এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার মৈত্রীর বন্ধন ও যৌথ প্রচেষ্টার সার্থক স্বাক্ষর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকুক।

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত আর শতবর্ষের গৌরব নিয়ে আজও পদ্মার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। অতিরিক্ত ৮ বছর চলছে। ২০১৫ সালে শতবর্ষ পূর্ণ করার আগেও যেভাবে ট্রেন চলেছে, এখনো একইভাবে চলছে। কোনো ঝাঁকুনি, শব্দ, ঝনঝনানি বা অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় না বলে জানান ট্রেন চালকেরা। আগে ৬০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালানো হলেও এখন ৪০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর নির্দেশনা রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মানুষ প্রতিদিনই পাকশী-ভেড়ামারায় ঐতিহ্যবাহী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ একনজর দেখার জন্য আসে। ■

প্রাবন্ধিক

মুয়াজ আজিজ
পঞ্চম শ্রেণি
মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

দেশে প্রথম শিক্ষা পার্ক

মাগুরার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে দেশের প্রথম ব্যতিক্রমী দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। ৩১শে জানুয়ারি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ পার্ক উদ্‌বোধন করেন। শিক্ষাপার্কটি আড়পাড়া সদর ডিগ্রি কলেজের ১০ শতাংশ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এছাড়াও ডিগ্রি কলেজের কয়েকটি কক্ষও ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিক্ষা পার্কটিতে আছে শিশুদের শিক্ষণীয় নানা বিষয় যা শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অবসর পেলেই শিক্ষাপার্কে আসছে। শুধু শিক্ষার্থী নয় অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের নিয়ে এই পার্কে যাচ্ছেন নতুন নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করতে, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে। ফলে শিশুদের পদচারণায় পার্ক এলাকা মুখরিত হয়ে উঠছে।

শিক্ষা পার্ক আছে টাইলসের উপর অ্যাম্বুস করা শালিখার ম্যাপ, যেখানে শালিখা সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। আছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ম্যাপ। টাইলসের উপর অ্যাম্বুস করে সকল সেক্টরকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যা দেখে একজন শিক্ষার্থী একনজরেই ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের তথ্যগুলো দেখে নিতে পারবে। ১০ ফুট/১০ ফুট মুক্তিযুদ্ধ বেদির প্রথমেই টাইলসের উপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি আছে। পাশেই তাঁর জীবনী। এর নিচে আছে তথ্য সম্বলিত সাত বীরশ্রেষ্ঠের ছবি। জাতীয় স্মৃতিসৌধও রয়েছে, যেখানে সাতটি স্তরের সাতটি সাল বর্ণনা করা আছে। এছাড়াও রয়েছে একটি সাহিত্য কর্নার, যেখানে আছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত বই এবং বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের আর্ট করা ছবি।

শিক্ষা পার্কটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ, যা দিয়ে চাঁদের পাহাড়- পর্বত পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাবে। সহজেই মহাকাশ পর্যবেক্ষন করা যাবে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা মহাকাশ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। রয়েছে একটি ইলেক্ট্রনিক মাইক্রস্কোপ যা দিয়ে জীবাণু জগৎ দেখা যাবে এবং কোষবিদ্যা সম্পর্কে জানতে পারবে। এছাড়াও রয়েছে ছয় ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ভূগোলক যা সহজে তার অক্ষে ঘুরতে পারে। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি সৌরমণ্ডল, প্রতিটি গ্রহের নাম, ওজন, ঘূর্ণায়ন গতি, সূর্য হতে দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তোলার জন্য রয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের রেপলিকা। বিশ্ব সভ্যতা ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য রয়েছে মেক্সিকোর চিচেন ইৎজার ও মিশরের পিরামিডের রেপলিকা। আরো আছে আইফেল টাওয়ারের রেপলিকা যা দেখে এর টেকনোলজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

শালিখা উপজেলা পরিষদের বাস্তবায়নে এবং জাইকার অর্থায়নে সারা দেশের মধ্যে প্রথম শিক্ষা পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। ■

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

স্বাধীনতা এল

জিশান মাহমুদ

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে
স্বাধীনতা এল
বীর শহিদের গৌরবকথা
কেমন করে ভুলো?
দেশের তরে জীবনখানা
বিলিয়ে দিলো যারা
লাল-সবুজের পতাকাটা
ছিনিয়ে আনল তারা।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বুকে সাহস নিয়ে
জয়ের মালা আনল কেড়ে
তাজা রক্ত দিয়ে।
শ্রদ্ধাভরে বীর ভাইয়েরা
তোমায় স্মরণ করি
রক্ত দিয়ে কেনা দেশকে
সোনার বাংলা গড়ি।

টুনটুনি

মারিয়াম জাহান

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
নাচে ডালে ডালে।

পাতায় বসে গায় গান
মাতায় বন-বাদার

বেগুন গাছে বাঁধে বাসা
দুই পাতার মাঝে

কান্না-হাসি-আশা,
ঘরকন্না পাতার ভাঁজে।

ঝড়-বাদলে বুকটা কাঁপে
যায় উড়ে সব।

তবু দমে নাকো
ছোট্ট পাখির দল।

দশম শ্রেণি
মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

'সকলের অংশগ্রহণ বন্যপ্রাণী হবে সংরক্ষণ'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৩রা মার্চ পালিত হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস। জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়।

২০১৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৬৮তম সাধারণ অধিবেশনে ৩রা মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১৪ সালে প্রথম দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বের বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদকূলের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা এই দিবসের মূল লক্ষ্য।

গবেষণায় দেখা গিয়াছে প্রায় ৮,০০০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় এটাও বিশ্বাস করা হয় যে এক মিলিয়ন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

বন্যপ্রাণী পাচার করা যে একটা বড়ো অপরাধ তা অনেকে জানে না। অনেকে অভাবের কারণে, অনেকে কাজের জন্য, অনেকে আবার শখ করেও এই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী। তবে ক্রমাগত আবাসস্থল ধ্বংস, খাদ্যাভাব এবং অবৈধ শিকারের কারণে দিন দিন এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা তৈরিতে প্রতি বছর পালিত হয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস।

বনভূমি, জলাভূমি বা লোকালয়ে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি প্রাণবন্ত করে তোলে বাংলার প্রকৃতিকে। পরিবেশগত দিক থেকেও প্রতিটি বন্যপ্রাণীর রয়েছে অপরিসীম অবদান। তবে মানুষের নানামুখী কর্মকাণ্ডে সংকুচিত হয়েছে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, কমেছে এদের সংখ্যা।

কিছু প্রজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণিত হয়েছে আর কিছু প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বন্যপ্রাণীদের যে প্রজাতিগুলো এখনো টিকে আছে সেগুলোও বর্তমানে বিপন্ন। এদের মধ্যে রয়েছে– হাতি, বাঘ, হনুমান, উল্লুক, শকুন, গেছো ব্যাঙ, মেছোবিড়াল, শুশুক ও সজারু প্রভৃতি প্রাণী।

প্রতিনিয়ত আবাসস্থল ও প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ার কারণে প্রাণীজগৎ হয়ে পড়েছে কোণঠাসা ও বিপদগ্রস্ত যা তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায়ের পথ সুগম করে দিচ্ছে।

বন্যপ্রাণীদের ভবিষ্যৎ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উদযাপিত এই দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের সবার সম্মিলিত উদ্যোগ পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে। সেই সাথে বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমাদের মহামূল্যমান বন্যপ্রাণীগুলোকে।■

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বনকোকিল

বনকোকিল অনেকটা কোকিলের মতো দেখতে। স্থানীয় প্রজাতির পাখি হলেও সচরাচর দেখা যায় না। থাকে গহিন বনবাদাড়ে। একসময় লোকালয়েও দেখা মিলত। এখন পাহাড়ি বন ও প্রাকৃতিক বনগুলোতেই বেশি দেখা যায়। একটি বা দুটির বেশি বনকোকিল কেউ একসঙ্গে দেখতে পায় না। সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানসহ বড়ো বড়ো বনে এখনো কিছু পাখি বনকোকিল আছে। ইংরেজি নাম (Green billed Malkoha)। বনভূমিতে বেশি দেখা যায় বলে পাখিটিকে অনেকে বলে বনকোকিল। বইয়ের ভাষায় নাম সবুজ ঠোঁট মালকোয়া। আকারে কাকের চেয়ে কিছুটা বড়ো। ওজন খুব বেশি না। মাথা, ঘাড় ও পিঠ ধূসরাভ সবুজ। গলা, বুক ও পেট হলদে ধূসর। লম্বা কালচে সবুজ লেজের পালকের প্রান্তে সাদা ছোপ। কোকিল প্রজাতির লম্বা লেজের পাখি এটি। চোখের চারপাশে পালকহীন ত্বক। ঠোঁটের গোড়া থেকে চোখের ওপর পর্যন্ত টকটকে লাল। যেন লাল কাজল লেপটানো। মাপ ৫১ সেন্টিমিটার। চোখ বাদামি, ঠোঁট সবুজ আর পা কালচে। বনকোকিল স্বভাবে নিভৃতচারী। এই পাখি কৌশল খাঁটিয়ে শিকার করে। পাতার সঙ্গে পালকের রঙের মিল থাকার কারণে বনের সাথে মিশে থাকে। বসন্তের কোকিলের মতো সুন্দর করে ডাকে না। চুপচাপই থাকে বেশি। মাঝে মাঝে খসখসে কণ্ঠে ডাকে 'কো... কো'। কোকিল গোত্রীয় পাখি হলেও অলস নয় বরং সংসারি। নিজেরা বাসা বানায় গাছের ডালে কাঠি ও ডালপালা দিয়ে এবং দুই-তিনটি ডিম পাড়ে। প্রজনন সময় এপ্রিল থেকে জুলাই মাস। বুদ্ধিমান ও লড়াকু স্বভাবের পাখি বনকোকিল। নিজের বাসার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না অন্য কোনো পাখিকে। দস্যুরানি হলেও। সুযোগ পেলে অন্য প্রজাতির শান্ত পাখিরা পর্যন্ত এদের দিকে তেড়ে যায়। গিরগিটি, নির্বিষ সাপ, ব্যাঙ, তক্ষক ইত্যাদি শিকার করে এরা। পতঙ্গ, ছোটো পাখি এবং পাখির ডিম-ছানাও খায় এরা। বন ও পাহাড় ধ্বংসের কারণে বনকোকিল এখন ঝুঁকির সম্মুখীন। ■

প্রতিবেদক: নাজমুল হক

প্রধানমন্ত্রীর কৃষি খামার

মুনিরা বেগম

'কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করতে হবে'– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের সবুজ বিপ্লবের ডাক থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরই কন্যা বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই থেকে কৃষির প্রতি তাঁরও আগ্রহ ছিল প্রবল।

এ দেশের মাটি-আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাই তো এ দেশের মাটি ও মানুষ, কৃষির সঙ্গে মিশে আছে তাঁর প্রাণ। বাবার দেখানো পথ ধরেই টুঙ্গিপাড়ার হাসুমনি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে গড়ে তুলেছেন বৈচিত্র্যময় এক কৃষি খামার।

বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলায় দেশের জনগণকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে এতেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, নিজেও তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের অব্যবহৃত প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগিয়েছেন। গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির মতো পুরো গণভবনকে একটি খামার বাড়িতে পরিণত করেছেন। গণভবনের এক ইঞ্চি মাটিও অব্যবহৃত রাখতে দেননি তিনি।

করোনা মহামারি, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে টালমাটাল বিশ্বে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় প্রতিটি বক্তব্যে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। তিনি সরকারি, বেসরকারি ও দলের সব অনুষ্ঠানে প্রতি ইঞ্চি

জমিকে আবাদের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

তিনি গণভবনের বিশাল আঙিনায় হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতের ধান, শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষ করছেন। তিল-সরিষার পাশাপাশি পেঁয়াজও বাদ যায়নি এই খামারে।

কি নেই এখানে– বাঁশফুল, পোলাও চাল, লাল চালসহ বিভিন্ন জাতের ধান; ফুলকপি, পাতাকপি, লালশাক, পালং শাক, ধনেপাতা, গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় বতুয়া শাক, ব্রোকলি, টমেটো, লাউ, সিমসহ প্রায় সব ধরনের শীতকালীন শাক-সবজি রয়েছে গণভবন

জুড়ে। এসব ফসল ফলাতে ব্যবহার করা হয় গণভবনের খামার থেকে উৎপাদিত জৈব সার।

এছাড়া গণভবনে তিল, সরিষা, সরিষা ক্ষেতে মৌচাক পালনের মাধ্যমে মধু আহরণ, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন ধরনের মশলা; আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, বরই, ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফল; গোলাপ, সূর্যলমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও বাগানও করছেন প্রধানমন্ত্রী। অবসরে প্রধানমন্ত্রী এগুলো তদারকি করেন।

এছাড়া গণভবন পুকুরে রয়েছে রুই-কাতল, তেলাপিয়া, চিতলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। অবসর সময়ে গণভবনের পুকুরের মাছও ধরেন তিনি। এছাড়া গণভবনের পুকুরের একটি অংশে মুক্তার চাষও করা হয়েছে।

গণভবন সূত্র থেকে জানা যায়, উৎপাদিত এসব ফসল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের জন্য সামান্য রেখে গণভবন কর্মচারী এবং দরিদ্র অসহায় মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

দেশের সরকার প্রধানের কৃষির প্রতি ভালোবাসার এ অন্যন্য দৃষ্টান্ত, সবাইকেই এগিয়ে যাওয়ার পথে অনুপ্রাণিত করবে।

সুতরাং, ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা যারা গ্রামে বাস করো তারা এখন থেকে বাড়ির আঙিনার আশপাশে গাছের চারা লাগাবে। আর যারা শহরে থাকো তারা বাসার বারান্দায় টবে অথবা বাড়ির ছাদে গাছ লাগাবে। তবেই আমাদের পরিবেশ সবুজ হবে এবং কিছুটা হলেও দূষণমুক্ত থাকবে। ■

ইংল্যান্ডকে বাংলাওয়াশ

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশের যে বাস্তবতা ছিল, তাতে একটি ম্যাচ জেতাই ছিল কল্পনা। কিন্তু সিরিজ শুরু হতেই একে একে আঁকা হতে থাকে স্বপ্নের সীমা পেরোনো একেকটি ছবি। চট্টগ্রামে প্রথম ম্যাচে জিতে এগিয়ে যাওয়া। এরপর ঢাকায় দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে নিশ্চিত হয় সিরিজ জেতা। শেষ ম্যাচ জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড দলকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ খেলায় বাংলাদেশ ১৬ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। হার এড়াতে ১৫৮ রানের লক্ষ্য নিয়ে তাড়া করে জিততে হতো ইংলিশদের। জবাবে ৬ উইকেটে ১৪২ রান তোলে ইংল্যান্ড। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো কোনো দলকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ।

টসে হেরে আগে ব্যাট করে লিটন দাসের হাফ সেঞ্চুরিতে ২ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে স্বাগতিকরা। বাংলাদেশ উড়ন্ত সূচনা করে। লিটন দাস ও রনি তালুকদার যোগ করেন ৫৫ রান। দুজনের রানের গতি বাড়াতে থাকেন দ্রুত। এই ব্যাটের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন ইংলিশ বোলাররা। লিটন পান হাফ সেঞ্চুরি। ৫৭ বলে ৭৩ রান করে আউট হন। নাজমুল শান্ত অপরাজিত থেকে করেন ৪৭ রান। ২০ ওভারে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২ উইকেটে ১৫৮ রান।

১৫৮ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাটে নামে ইংল্যান্ড। প্রথম ওভারেই হোঁচট খায় ইংল্যান্ড। কিন্তু বাটলারের সঙ্গে ৯৫ রানের জুটিতে ডেভিড মালান দলকে ১৩ ওভারে ১০০ রান করায় জয় ছিল হাতের নাগালে। সেখান থেকেই ২ বলের মধ্যে বদলে যায় খেলার পরিস্থিতি। তারপর অধিনায়ক বাটলার ও বেন ডাকেট এগিয়ে নিয়ে যান দলকে। কিন্তু বেন ডাকেট বল ঠেলেই ছুটেছিলেন, বাটলারও সাড়া দেন। ম্যাচের লাগামও তখনই অনেকটা ছুটে গেল ইংল্যান্ডের হাত থেকে। উজ্জীবিত বাংলাদেশ আরো চেপে ধরল। শেষ ওভারে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ২৭ রানের। কিন্তু নিতে পারে ১০ রান। আর বাংলাদেশ পেয়ে যায় ১৬ রানের এক মহাকাব্যিক সিরিজ জয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইংলিশদের বিপক্ষে টানা তৃতীয় ম্যাচ জিতে ক্রিকেটাররা মেতে উঠে উল্লাসে।

অভিষেক হওয়া স্পিনার তানভীর ১, তাসকিন ২, সাকিব আল হাসান ও মুস্তাফিজ ১টি করে উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে টানা তৃতীয় জয় এনে দেয়। ম্যাচ সেরা পুরস্কার পান লিটন দাস। আগের দুই ম্যাচের পর তৃতীয় ম্যাচে রান করে সিরিজ সেরা তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার শান্ত। তিন ম্যাচে এক হাফ সেঞ্চুরিসহ ১২৭.৪৩ স্ট্রাইক রেটে ১৪৪ রান করেন তিনি। ■

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

মাটির নিচে গ্রাম

গ্রামের সব বাড়িই মাটির নিচে । প্রজন্মের পর প্রজন্ম মাটির নিচে বসবাস করছে গ্রামটির বাসিন্দারা। রহস্যময় ওই গ্রামটিতে মানুষ বসবাস করছে প্রায় ২০০ বছর ধরে। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার ঘরবাড়ি রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বাসিন্দাই গ্রামটি ছেড়ে চলে গেছেন। তারপরও এখনো সেখানে বসবাস করছেন ৩ হাজারের মতো মানুষ। চীনের হেনান প্রদেশের সানমেনেঙ্গিয়ার এ গ্রামটি পর্যটকদের জন্য এখন দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

মাটির নিচে তৈরি এ ঘরগুলোকে চীনা ভাষায় বলা হয় 'ইয়ায়োডং', যার অর্থ গুহা ঘর । ঐতিহাসিকদের মতে, হেনান প্রদেশের সানমেনেঙ্গিয়ার ইয়ায়োডংয়ে বসবাসের ইতিহাস ২শ বছরের বেশি প্রাচীন নয়। তবে চীনের পার্বত্য এলাকায় আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্রোঞ্জ যুগে এ ধরনের গুহা ঘর তৈরি করে বসবাস করতেন একদল মানুষ। বর্তমান বাসিন্দাদের ছয় প্রজন্ম আগে এখানে মানুষের বসবাস শুরু হয়। অদ্ভুত এই গ্রামের ঘরগুলো মাটি থেকে ২২/২৩ ফুট নিচে অবস্থিত। ঘরগুলো ৩৩ থেকে ৩৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা। চারকোনা ঘরগুলোতে শীতকালে তাপমাত্রা থাকে ১০ ডিগ্রি। গরমে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় না। গ্রামটির বাসিন্দারা জানান , মাটির নিচে ঘরগুলো খুবই আরামদায়ক। কারণ এ ঘরগুলো শীতকালে গরম আর গরমকালে ঠান্ডা থাকে। এখানের প্রতিটি বাড়ির স্থাপত্য পরিকল্পনা এক কথায় অসাধারণ।

বাড়িঘরগুলোর উপরের মাটিতে গাছ লাগান স্থানীয়রা। শুধু তাই নয়, বাড়ির উপরে ও পাশের অংশে চাষাবাদও করেন তারা। এর ফলে শুধু ফসল উৎপাদনই নয়, ভূমিক্ষয় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ২০১১ সালে গ্রামটি চীনা ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পায়। স্থানীয় সরকার এটি সংরক্ষণ করছে। গুহা ঘরগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগসহ সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ভূমিকম্পেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এসব ঘর। সেই সঙ্গে এগুলো শব্দ নিরোধকও। ■

প্রতিবেদন: আবু নাসের

এই গরমে করণীয়

নবারুণের বন্ধুরা, গরম পড়তে শুরু করেছে। রোদের তীব্রতা বাড়ছে ক্রমেই। এ সময় সুস্থ থাকতে খাবারদাবারে আনতে হবে পরিবর্তন। কেমন খাবার এ সময়ের উপযোগী তা তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম। বন্ধুরা এই সময়ে গরমে ঘামের কারণে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি বেরিয়ে যায়। পানিস্বল্পতা পূরণে এখন থেকেই তরল খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। দিনে দু-তিন লিটার বিশুদ্ধ পানির পাশাপাশি ডাবের পানি, লেবুপানি, বেলের শরবত, ঘরে বানানো দইয়ের লাচ্ছি ও তাজা ফলের রস ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করতে হবে। পানীয় নির্বাচনে মাথায় রাখতে হবে বাজারের কেনা চিনিযুক্ত কোমল পানীয়, জুস, চা, কফি দেহকে আরো পানিশূন্য করে।

গরমে সর্দি-কাশি হওয়ার ঝুঁকি কমাতে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি দৈনিক খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ টক ফল ও সবজি, যেমন কমলা, মাল্টা, আনারস, পেয়ারা, ক্যাপসিকাম বেশ ভালো কাজ দেয়। এ ছাড়া গরম স্যুপ, গ্রিন টি, তুলসি চা, আদা চা বা যে-কোনো হারবাল চা সর্দি, কাশি, গলাব্যথা নিরাময়ে বেশ কার্যকর। গরম পানিতে হালকা মধু, আদা, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদি মসলা দিয়ে খেলেও ভালো ফল পাবে।

ঠান্ডার সমস্যা না থাকলে গরমে ঠান্ডা পানি খেতে বাধা নেই। তবে শিশুরা যেন ফ্রিজের ঠান্ডা পানি কম খায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ ছাড়া ফ্রিজ থেকে কোনো খাবার বের করে সঙ্গে সঙ্গে খাবে না। কয়েক মিনিট স্বাভাবিক তাপে রেখে তারপর খাবো।

শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, লাল মাংস, তেলে ভাজা খাবার, ফাস্টফুড বা অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর খাবারের পরিবর্তে মৌসুমি শাকসবজি, ফলমূল, মাছ ও মুরগির মাংসকে খাদ্যতালিকায় প্রাধান্য দিতে হবে। মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি এ জাতীয় খাবার এই সময়ে বাদ দেওয়াই ভালো। রুটির ক্ষেত্রে লাল আটা এবং ভাতের জন্য লাল চাল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গরমে বাইরের খোলা খাবার ও পানীয় গ্রহণের হার বেড়ে যায়। তার ওপর গরমে সহজেই খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়। বাড়ে মাছি ও পোকামাকড়ের বিস্তার, যা রোগবালাই ছড়াতে সাহায্য করে। এসবের ফলে বাড়ে পানি ও খাবারবাহিত রোগের প্রকোপ। এসব রোগ থেকে বাঁচতে, বিশেষ করে রাস্তার খোলা খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। বাইরের খাবার না খেয়ে ঘরের তৈরি খাবার ও পানীয় সঙ্গে রাখবে। সুস্থ থাকতে বাসি বা ঠান্ডা খাবার না খেয়ে যথাসম্ভব গরম ও টাটকা খাবার খেতে চেষ্টা করবে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে যে-কোনো কাজ সঠিক সময়ে করা সম্ভব। আর সময়ের কাজ সময়ে করলে সফলতা আসবেই। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

ছোটোদের ছড়া

মার্চ

সিফাত কাদের

মার্চ আমার অহংকার
পুত্রহারা মায়ের দীর্ঘশ্বাস,
শোকে পাথর বোন
দুঃখের পাথার মন।
মার্চ আমার স্বাধীনতা
পলাশ ফোটে থোকা থোকা,
গল্পে ঠাসা ঠাকুরমার ঝুলি
আমার গর্জে ওঠা গুলি।
মার্চ শিকল ভাঙার গান
গর্বে ভরা আমার মান,
অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে
আমরা স্বাধীন।

একাদশ শ্রেণি
রাজরাড়ি সরকারি কলেজ, রাজবাড়ি

সেই ভাষণ

মো. সজীব হোসেন

বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন
১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে
হৃদয় কাঁপানো সেই ভাষণ শুনতে
জনতা হাজির হলো ঢাকার রেসকোর্সে।

জ্বালাময়ী এ ভাষণে কেঁপে উঠল
পাকিস্তানি নেতাদের হৃদয়
বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ এনে দিল
আমাদের মহান স্বাধীনতা।

৮ম শ্রেণি, হায়দার স্কুল অ্যান্ড কলেজ
মান্ডা, ঢাকা

দেশের প্রাণ

মিনহাজুল ইসলাম

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম তাঁহার
দেশের প্রতি ছিল অনেক টান
বড়ো হয়ে হলেন তিনি
বাংলাদেশের প্রাণ।

মনটা ছিল সহজ-সরল
অগাধ ভালোবাসা ছিল হৃদয়ে
সবার দুঃখ-কষ্টে নিজেকে
দিতেন সর্বদা বিলিয়ে।

বাংলাদেশের মাটিতে
যতদিন একটি মানুষ থাকবে
বঙ্গবন্ধুর কীর্তির কথা
সবার হৃদয়ে গাথা রবে।

একাদশ শ্রেণি
পলিটেকনিক কলেজ, কুমিল্লা

প্রিয় নাম

আশফিয়া আক্তার

সবার হৃদয় জুড়ে আছে
এমন একটি নাম
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
মানুষকে ভালোবাসা ছিল তাঁর
একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য
শত্রুরা তাঁকে জেলে নিয়ে যান।

৭ম শ্রেণি, বারহাট্টা হাই স্কুল, নেত্রকোনা

প্রদীতি মৃধা, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

লাবিবা জামান লিবা, তৃতীয় শ্রেণি, ইন্সটিটিউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর

নেটদুনিয়া মাতাচ্ছেন ফ্লোরেন্স

ইদানীং ইংরেজি গানই বেশি করে ফ্লোরেন্স। ‘ স্টেরিও হার্টস’ কিংবা ‘আনটিল আই ফান্ড ইউ’ কভার করে নেটদুনিয়ায় প্রশংসায় ভেসেছে সে। রীতিমতো তারকা খ্যাতি পেয়ে গেছে এ তরুণী। তবে ফ্লোরেন্স বৈদ্যকে ফেসবুক দুনিয়ার মানুষ প্রথমে চিনেছিল তাঁর বাংলা গান শুনে ২০২১ সালে ফ্লোরেন্স ও তার বন্ধু মিলে কভার করেছিল মাইলসের ‘নীলা’। ভিডিও রেকর্ড করে ফেসবুকে আপলোড করতেই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে গানটি। ভিউ ছাড়িয়ে যায় আট লাখ, শেয়ার হয় প্রায় চার হাজার বার।

নেটদুনিয়ায় সকলের প্রশংসা পেয়ে ২০২১ সালে নিজের একটা ফেসবুক পেজ খুলে ফ্লোরেন্স বৈদ্য। নাম দেয় ‘ফিরেনজে’ (ফ্লোরেন্সের ইতালীয় রূপ)। এখন সেখানে নিয়মিত নতুন নতুন গানের কভার আপলোড করে সে। সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলে কণ্ঠ দিয়েছে ফ্লোরেন্স। সংগীত পরিচালনার নানাদিক শেখার ও চেষ্টা করছে সে।

রাজধানীর হলিক্রস কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনা করলেও তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা সিলেটে। মাধ্যমিক পর্যন্ত সেখানেই পড়ালেখা করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথম গান শেখা। শুরুটা হয়েছিল ক্ল্যাসিক্যাল গান দিয়ে। পরে ইংরেজি গানের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে থাকে। অষ্টম শ্রেণিতে পরীক্ষা শেষে একদিন গান রেকর্ড করার ফেইস আপলোড করে ফ্লোরেন্স। তখন থেকেই অনলাইনে মাঝেমধ্যেই গান তুলে দিত সে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আরো বেশি বেশি গান আপলোড করতে থাকে। ঢাকায় এসে হলিক্রস কলেজে ভর্তির পর থেকে পুরোদমে গান নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফ্লোরেন্স।

গানের বাইরে গল্প পড়তে ও শুনতে খুব ভালোবাসে ফ্লোরেন্স বৈদ্য। নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে, পাশাপাশি গানও চালিয়ে যেতে চায় আজীবন। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

সৈয়দ ফারসাদ নেয়ামুল সীন
পঞ্চম শ্রেণি
সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

লন্ডনে সাতই মার্চ ভাষণের চিত্রকর্ম

যুক্তরাজ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্রকর্ম অবমুক্ত করলেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডন আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের অনুষ্ঠানে হাইকমিশনে বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ইউকের পক্ষ থেকে শিল্পী মাসুদ মিজানের আঁকা চিত্রকর্মটি উপহার দেওয়া হয়। এক্রিলিকে আঁকা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের চিত্রকর্মটি হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের হাতে তুলে দেন ক্লাবের পরিচালনা পরিষদের সদস্য সাংবাদিক তানভীর আহমেদ।

সেই দুটি চারা

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর বনের দোখলা রেঞ্জ। বনের এই অংশে প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। তথ্য সূত্র অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলকে নিয়ে মধুপুর বনের দোখলা রেঞ্জের বাংলোতে বেড়াতে এসে তিন দিন ছিলেন। এ বাংলোতে বসেই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া তৈরির প্রাথমিক কাজ করেন বঙ্গবন্ধু। এ সময় তিনি রেঞ্জ অফিস লাগোয়া রেস্টহাউস প্রাঙ্গনে একটি আম ও একটি রক্তচন্দন গাছ লাগিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে দোখোলা রেস্টহাউসের প্রত্যক্ষদর্শী চৌকিদার তখনকার বনকর্মী মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) নিশ্চিত করেছেন বঙ্গবন্ধু সেদিন রেস্টহাউসের দু'পাশে একটি আম ও রক্তচন্দন গাছ লাগিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই চারাগাছ আজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার 'তর্জনী'

বাংলায় সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দিতে জাতীয় মোবাইল ব্রাউজার (ওয়েবসাইট দেখার অ্যাপ) 'তর্জনী' চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ। ৭ই মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে ব্রাউজারটির উদবোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের স্মরণে এ ব্রাউজারটি উদবোধন করা হয়। ব্রাউজারটির বৈশিষ্ট্য হলো এতে বাংলা ভাষা রয়েছে এবং এর বাংলা অপটিমাইজেশন অন্যান্য ব্রাউজারের তুলনায় শক্তিশালী। ব্রাউজারটিতে ইংরেজি ভাষাও নির্বাচন করা যাবে। সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ব্রাউজারটিতে রয়েছে 'তর্জনী' সার্চ বার, ডার্ক মোড, ট্যাব, বিজ্ঞাপন বন্ধ, বুকমার্ক, ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা, ইনকগনিটোসহ বিভিন্ন সুবিধা। অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর এবং গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে জাতীয় ব্রাউজার 'তর্জনী' অ্যাপটি।

মানচিত্র, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় পতাকা ফসলের ক্ষেতে

জাতীয় পতাকা, স্মৃতিসৌধ ও মানচিত্রের আদলে মাঠ সাজিয়েছেন শেরপুরের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬শে মার্চ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এ স্থানটি। এরপর ধান আর সবজি দিয়ে সাজানো স্মৃতিসৌধ, মানচিত্র ও জাতীয় পতাকা দেখতে ভিড় করে সাধারণ মানুষ। জনসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এ মাঠটি উদবোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান আতিক। শেরপুরের কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ধানের মাঠে ১৬০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৯৬ ফুট প্রস্থ এবং ৩২ ফুট বৃত্তের ব্যাসার্ধের জাতীয় পতাকা তৈরি করেছে। এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যতিক্রমী এই আয়োজন করা হয়েছে। শেরপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রায় ৪৩ একর জমির বিশাল এলাকায় ধান ও সবজির প্রদর্শনী প্লট। এর মাঝে বিশাল এক পতাকার সবুজ অংশ বঙ্গবন্ধু ১০০ ও হাইব্রিড এবং মাঝখানে বৃত্তের লাল অংশ দুলালী সুন্দরী ধানের চারা দিয়ে সাজানো হয়েছে। পাশেই সবজির প্লটে লালশাক ও পাটশাকের চারা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র ও স্মৃতিসৌধ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ছোটোদের আঁকা

রহমাতুল আলম, দ্বিতীয় শ্রেণি, গণভবন সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

তারান্নুম সাদিকা, পঞ্চম শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

ফাইজা রহমান কণা, সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাদিয়া মোস্তফা সামান্তা
পঞ্চম শ্রেণি
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল
অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

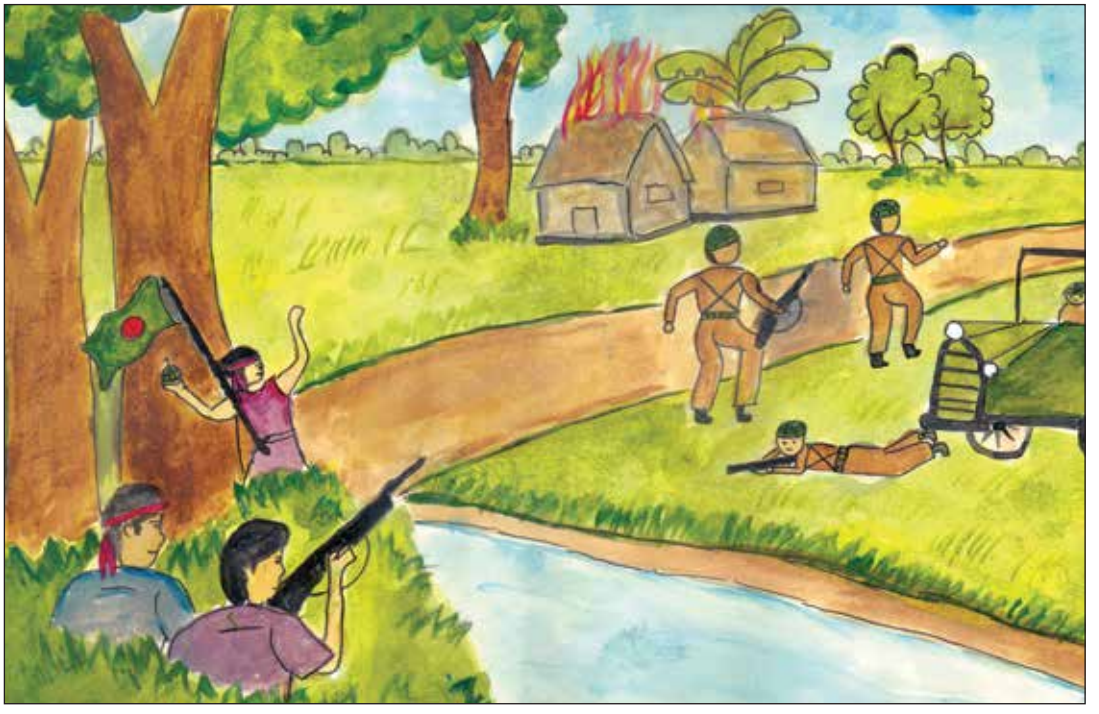

নোরিশা রহমান অনন্যা, সপ্তম শ্রেণি, শেরে-বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

নিভৃতি রায় সেন, ষষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-09, March 2023 , Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশানা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা